দাম : ষোলো টাকা

স্বস্তিকা

ভারতীয় সংবিধানের প্রকৃত জনক কে?
— পৃঃ ২৩

সুভাষচন্দ্র এবং বাঙ্গালির মনস্তত্ত্ব
— পৃঃ ৩১

৭৬ বর্ষ, ১৮ সংখ্যা।। ২২ জানুয়ারি, ২০২৪।। ৭ মাঘ, ১৪৩০।। যুগাব্দ - ৫১২৫।। সাধারণতন্ত্র বিশেষ সংখ্যা।। website : www.eswastika.com

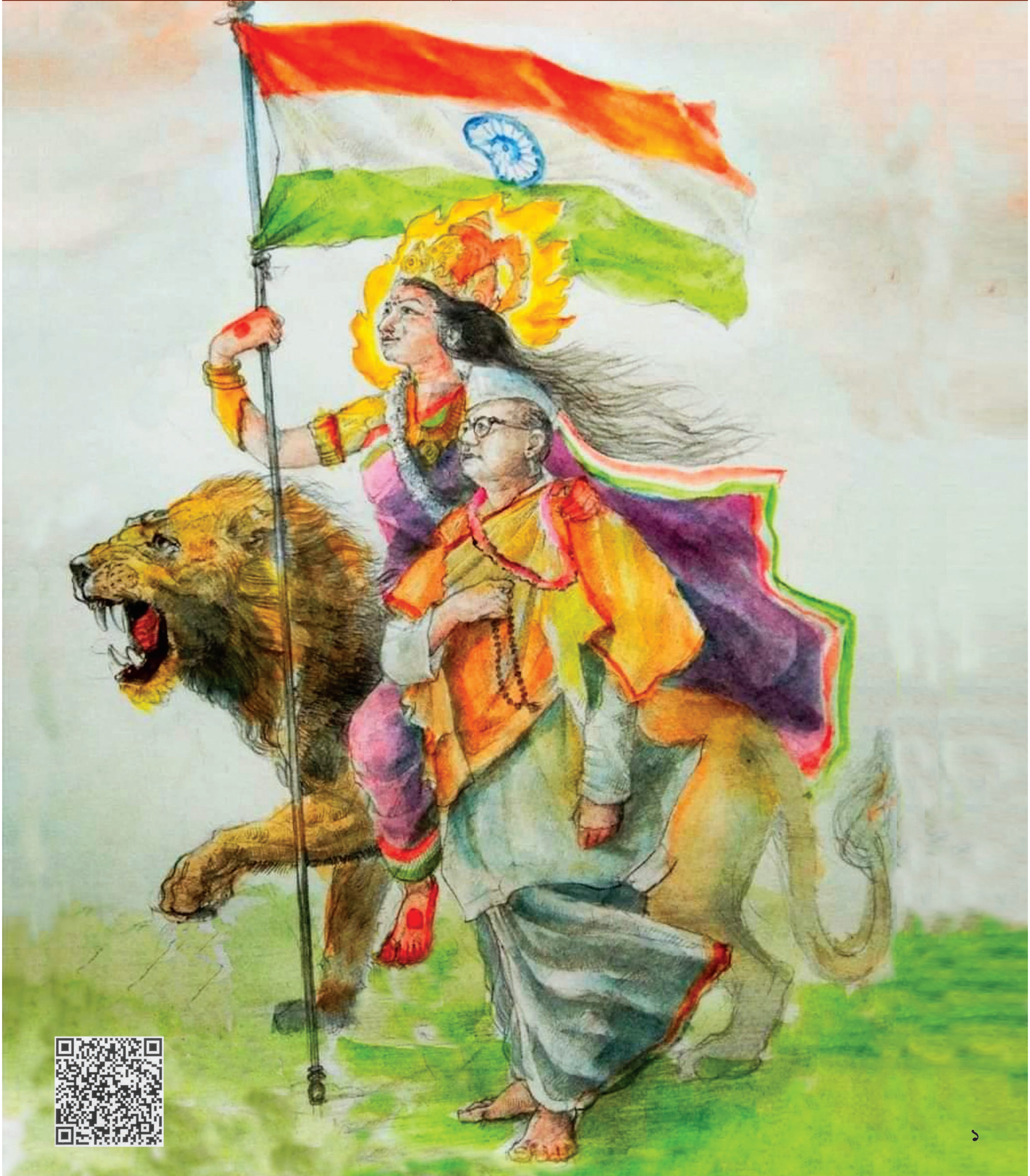

CENTURYPLY®

CENTURYPLY® CENTURYLAMINATES® CENTURYVENEERS®

CENTURYPRELAM® CENTURYMDF® CENTURYDOORS™

zykron FIBRE CEMENT BOARDS & PLANKS

STARKE NEW AGE PANELS

SAINIK PLYWOOD HAMESHA TAIYYAR

For any queries, **SMS 'PLY'** to **54646** or call us on **1800-2000-440** or give a missed call on **080-1000-5555**

E-mail: **kolkata@centuryply.com** | CenturyPlyOfficial | CenturyPlyIndia | YouTube Centuryply1986 | Visit us: **www.centuryply.com**

স্বস্তিকা

।। বাংলা সংবাদ সাপ্তাহিক।।

সাধারণতন্ত্র বিশেষ সংখ্যা

৭৬ বর্ষ ১৮ সংখ্যা, ৭ মাঘ, ১৪৩০ বঙ্গাব্দ

২২ জানুয়ারি - ২০২৪, যুগাব্দ - ৫১২৫,

Website : www.eswastika.com

সম্পাদক : তিলক রঞ্জন বেরা

সহ সম্পাদক : সুকেশ চন্দ্র মণ্ডল

রূপায়ণ : অজিত কুমার ভকত

দূরভাষ :

সম্পাদকীয় : ৮৪২০২৪০৫৮৪ (W)

সার্কুলেশন : ৮৬৯৭৭৩৫২১৫

সার্কুলেশন হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বর : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪

বিজ্ঞাপন : ৯৩৩০৩৭৭৯২৩

দাম : ১৬ টাকা

বার্ষিক গ্রাহক মূল্য ৭০০ টাকা।

Postal Registration No.- KOL RMS/048/2022-2024

R N I No. 5257/1957

দূরভাষ : ২২৪১-০৬০৩

E-mail : swastika5915@gmail.com

vijoy.adya@gmail.com

Website : www.eswastika.com

শুভস্বস্তিকা প্রিন্টস ফাউন্ডেশন -এর পক্ষে প্রকাশক এবং মুদ্রক সারদা প্রসাদ পাল কর্তৃক ২৭/১বি, বিধান সরণি, কলকাতা-৬ থেকে প্রকাশিত এবং সেবা মুদ্রণ, ৪৩, কৈলাশ বোস স্ট্রীট, কলকাতা-৬ হতে মুদ্রিত।

সূচীপত্র

সম্পাদকীয় ◻ ৫

বিদেশি বাম আর পুরোনো কংগ্রেসি দুষ্কৃতীদের তোল্লা দিচ্ছে তৃণমূল—‘হাঁটি হাঁটি পা পা’... ◻ নির্মাল্য মুখোপাধ্যায় ◻ ৬

বাণিজ্যে বসতে মোদী, দিদি বসতে চপশিল্পে

◻ সুন্দর মৌলিক ◻ ৭

‘মেড ইন ইন্ডিয়া’ : একটি গুণমান নির্দেশক চিহ্ন

◻ পীযূষ গোয়েল ◻ ৮

নেতাজী : কংগ্রেসের উদাসীনতা ◻ বিশ্বামিত্র ◻ ১০

ভারতীয় গণতন্ত্র— স্বীকৃতি ও বিকৃতি

◻ অংশুমান গঙ্গোপাধ্যায় ◻ ১১

ভারতে ক্রুশের করাল গ্রাস—একটি পর্যালোচনা

◻ তন্বী শুকুল ◻ ১৩

সংবিধানের প্রকৃত জনক কে? ◻ নন্দলাল ভট্টাচার্য ◻ ২৩

দেশের স্বার্থের বদলে দল ও ব্যক্তিস্বার্থে ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের কিছু বিচিত্র কর্মকাণ্ডের ইতিহাস

◻ অধ্যাপক বিমল শঙ্কর নন্দ ◻ ২৬

ভারতীয় ডাকটিকিটে সাধারণতন্ত্র দিবস

◻ ড. কল্যাণ চক্রবর্তী ◻ ২৮

সুভাষচন্দ্র এবং বাঙ্গালির মনস্তত্ত্ব ◻ অমিত দাস ◻ ৩১

নাগরিকত্ব সংশোধনী আইন লাগু হলে বাঙ্গালি হিন্দুদের জন্য তা হবে কেন্দ্রীয় সরকারের সেরা উপহার ◻ ধর্মানন্দ দেব ◻ ৩৬

ভারতের সংবিধান এবং ধর্মনিরপেক্ষতা

◻ পৃথা রায়চৌধুরী ◻ ৪৩

নিয়মিত বিভাগ :

চিঠিপত্র : ১৯, ২১ ◻ সুস্বাস্থ্য : ২২ ◻ সমাবেশ সমাচার : ৩০ ◻ অন্যরকম : ৩৯ ◻ নবাঙ্কুর : ৪০-৪১ ◻ অঙ্গনা : ৪৫ ◻ সংবাদ প্রতিবেদন : ৪৮

এবারের প্রচ্ছদের ছবিটি এঁকেছেন শীর্ষ আচার্য্য

প্রকাশিত হবে ২৯ জানুয়ারি, ২০২৪

স্বস্তিকা

প্রকাশিত হবে ২৯ জানুয়ারি, ২০২৪

আগামী সংখ্যার আকর্ষণ

রাষ্ট্রীয় অস্মিতার পুনঃপ্রতিষ্ঠায় শ্রীরামমন্দির

স্বাধীনতার বহু বছর পর বর্তমান কেন্দ্রীয় সরকারের শাসনকালে এক দশক যাবৎ দেশের মানুষ সুশাসনের স্বাদ পেয়ে চলেছে। কেন্দ্রীয় সরকারের বিভিন্ন জনকল্যাণমুখী প্রকল্প তারই প্রমাণ। রাষ্ট্রীয় অস্মিতার পুনঃপ্রতিষ্ঠায় শ্রীরামমন্দিরের পুনর্নির্মাণও সুশাসনের একটি উল্লেখযোগ্য প্রয়াস।

স্বস্তিকার আগামী সংখ্যায় এই বিষয়েই আলোকপাত করবেন বিশিষ্ট লেখকরা।

বিজ্ঞপ্তি

স্বস্তিকার সকল গ্রাহক ও প্রচার প্রতিনিধিদের অনুরোধ করা যাচ্ছে যে, তাঁরা যেন তাঁদের দেয় টাকা নিম্নবর্ণিত ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে **NEFT**-র মাধ্যমে সরাসরি জমা দেন। যে কোনো ব্যাঙ্কের শাখা থেকে টাকা পাঠাতে পারেন।

স্বস্তিকার প্রচ্ছদে **QR code** ছাপানো হচ্ছে। এখানেও সরাসরি টাকা পাঠাতে পারেন।

টাকা পাঠিয়ে স্বস্তিকা দপ্তরে অবশ্যই জানাবেন।

ফোন : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪, ৮৬৯৭৭৩৫২১৫,

হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বর : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪

Account Name :
SUBHSWASTIKA PRINTS FOUNDATION
A/C. No. : **103502000100693**
IFSC Code : **IOBA0001035**
Bank Name :
INDIAN OVERSEAS BANK
Branch : **Sreemani Market Kolkata-700 006**

একটি বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

হিন্দু জাতীয়তাবোধের কণ্ঠস্বর সাপ্তাহিক স্বস্তিকা পত্রিকা অনেক চড়াই-উতরাই পেরিয়ে ২০২২ সালে পঁচাত্তর বর্ষে পদার্পণ করেছে। এই শুভ অবসরে আমরা স্বস্তিকার পাঠক ও শুভানুধ্যায়ীদের কাছে একটি বিশেষ আবেদন রাখছি। সাপ্তাহিক স্বস্তিকার আজীবন এবং দশ বছরের সদস্য হিসেবে নাম নথিভুক্ত করার সিদ্ধান্ত হয়েছে। আজীবন সদস্যতার জন্য ২৫,০০০ (পঁচিশ হাজার) টাকা এবং দশ বছরের সদস্যতার জন্য ১০,০০০ (দশ হাজার) টাকা ধার্য করা হয়েছে। সদস্যদের কাছে প্রতি মাসের শেষ সপ্তাহে চারটি/পাঁচটি সংখ্যা (বিশেষ সংখ্যা-সহ) এক সঙ্গে রেজিস্ট্রি ডাকযোগে পাঠানো হবে। সকল পাঠক ও শুভানুধ্যায়ীর নিকট বিনীত নিবেদন, তাঁরা যেন এই বিষয়টিকে গুরুত্ব দিয়ে বিবেচনা করেন এবং আমাদের পূর্ণ সহযোগিতা করেন।

সদস্যতার জন্য টাকা পাঠাবার নিয়ম ঃ—

স্বস্তিকা দপ্তরে টাকা জমা দিতে পারেন। সেক্ষেত্রে অবশ্যই চেকSubhswastika Prints Foundation -এই নামে দিতে হবে। এছাড়া সরাসরি অনলাইনে টাকা পাঠাতে পারেন। টাকা পাঠানোর সঙ্গে সঙ্গে আপনার পূর্ণ ঠিকানা পিন কোড সহ, ফোন নম্বর দিয়ে স্বস্তিকার সম্পাদকের নামে একটি চিঠি দিয়ে জানান। যাতে আপনার দেওয়া টাকার রশিদ ও স্বস্তিকা নিয়মিত আপনার ঠিকানায় পাঠানো সম্ভব হয়।

অনলাইনে টাকা পাঠানোর ঠিকানা—

Account Name : **SUBHSWASTIKA PRINTS FOUNDATION**
Bank A/c --- 103502000100693
IFSC -- IOBA0001035
Bank -- Indian Overseas Bank
Branch : Sreemani Market, Kolkata-700006.

জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী

সম্পাদকীয়

জাতির স্ব-তন্ত্র প্রতিষ্ঠা

১৯৪৭ সালের ১৫ আগস্ট ভারত ঔপনিবেশিক শাসন হইতে মুক্ত হইয়া স্বাধীনতা লাভ করিয়াছে। তাই ১৫ আগস্ট জাতির জীবনে শ্রেষ্ঠ দিন হিসাবে স্বর্ণাক্ষরে লিখিত রহিয়াছে। কিন্তু খুব পরিষ্কার ভাবে দেখিলে ওইদিন ক্ষমতার হস্তান্তর হইয়াছে মাত্র, জাতির স্ব-তন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয় নাই। কেননা ওইদিন স্বাধীনতা লাভ করিলেও দুই বৎসরেরও অধিক সময় প্রধানরূপে জাতির মাথায় বসিয়া ছিলেন ইংল্যান্ডের রাজা ষষ্ঠ জর্জ এবং ভারতের গভর্নর জেনারেল লুই মাউন্টব্যাটেন। ভারতের আকাশে তখনও সগর্বে উড্ডীন ছিল ইউনিয়ন জ্যাক। ঘোষিত স্বাধীনতা পাইবার পরও ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইন বলবৎ ছিল। ভারতের প্রকৃত স্বাধীনতা আসিয়াছে ১৯৫০ সালের ২৬ জানুয়ারি। ওই দিন হইতে ভারত স্ব-তন্ত্রের পথে চলিতে শুরু করিয়াছে। ১৯৪৭ সালের ২৮ আগস্ট দেশের সংবিধান রচনার জন্য ড. বি আর আম্বেদকরকে সভাপতি করিয়া কমিটি গঠিত হইয়াছে। তাহারও আবার বিভিন্ন উপ কমিটি গঠন করা হইয়াছে। দুই বৎসর এগারো মাস আঠারো দিন ধরিয়া বিভিন্ন পর্যালোচনা এবং একশত ছেষট্টি বার অধিবেশন সম্পন্ন করিয়া সংবিধান রচনার কার্যটি সুসম্পন্ন হয়। তাহার পর ভারতীয় গণপরিষদে ১৯৪৯ সালের ২৬ নভেম্বর সেই সংবিধান গৃহীত হয়। এবং ইহার দুইমাস পর ভারতীয় শাসনতন্ত্রে ২৬ জানুয়ারি হইতে সংবিধান কার্যকর হয়। এই দিনটিও একটি বিশেষ গুরুত্ব বহন করিতেছিল। ভারতীয় নেতৃবৃন্দ ১৯২৯ সনের ৩১ ডিসেম্বর ইরাবতী নদীর তীরে ১৯৩০ সনের ২৬ জানুয়ারি দিনটিতে পূর্ণ স্বাধীনতা দিবস উদ্‌যাপনের শপথ গ্রহণ করিয়াছিলেন। সংবিধান গৃহীত হইয়া প্রকৃতপক্ষে এইদিন হইতেই ভারত চিরতরে ঔপনিবেশিক শাসন হইতে মুক্ত হইয়া নিজস্ব শাসন বলবৎ করিয়াছে। তাই এইদিনটি জাতির জীবনে সাধারণতন্ত্র বা গণতন্ত্র দিবস রূপে চিহ্নিত হইয়াছে। ইহা খুব গর্বের বিষয় যে ভারতীয় গণতন্ত্র বিশ্বের শ্রেষ্ঠ গণতন্ত্র হিসাবে মান্যতা প্রাপ্ত হইয়াছে। ভারতীয় সংবিধান হিন্দি ও ইংরাজিভাষায় সুন্দর হস্তাক্ষরে লিপিবদ্ধ করা হইয়াছে। মূল প্রতিলিপি দুইটি সংসদ ভবনের গ্রন্থাগারে নাইট্রোজেন গ্যাসচেম্বারে সংরক্ষিত রহিয়াছে। তাহা খুব কম ব্যক্তিরই চাক্ষুষ করিবার সৌভাগ্য হইয়াছে। প্রস্তাবনা-সহ ২২টি অধ্যায় সংবলিত ভারতীয় সংবিধানে ভারত শাসনের আইন ও নীতি লিপিবদ্ধ করিয়াছেন সংবিধান প্রণেতাগণ। সংবিধান সুন্দর হস্তাক্ষরে লিপিবদ্ধ ও চিত্রায়ণ করিবার কাজটি করিয়াছেন শান্তিনিকেতনের আচার্য নন্দলাল বসু-সহ বেশ কয়েকজন শিল্পী। অঙ্কিত চিত্রসমূহের মাধ্যমে ভারতবর্ষকে প্রস্ফুটিত করা হইয়াছে। তাহার দ্বারা হাজার হাজার বৎসরের ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতির দিকনির্দেশ করা হইয়াছে। ভারতের সংবিধান ভারতের আইন প্রণেতাদের নিকট গীতাস্বরূপ এবং সংবিধানের বিভিন্ন ধারা রূপায়ণ করিবার স্থান সংসদ ভবন গণতন্ত্রের মন্দিরস্বরূপ। ভারতের বর্তমান প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী প্রথমবার নির্বাচিত হইয়া সংসদ ভবনে প্রবেশ করিয়া সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করিয়াছেন।

ভারতীয় সংবিধান ভারতীয় আইন প্রণেতাদের নিকট পরম শ্রদ্ধার হইলেও রাজনৈতিক স্বার্থসিদ্ধির জন্য তাহার কম অবমাননা হয় নাই। কম কাটাছেঁড়া হয় নাই। তুষ্টিকরণের রাজনীতির জন্য কংগ্রেস সরকার বহুবার সংবিধানের অপপ্রয়োগ করিয়াছে। দেশের সংহতি, নিরাপত্তা অখণ্ডতার পক্ষে বিপজ্জনক ধারাও সংযোজিত করিয়াছে। সংবিধানের প্রস্তাবনা যাহাকে সংবিধানের আত্মা বা বিবেক বলা হইয়া থাকে, তাহারও ব্যবচ্ছেদ করিয়াছেন কংগ্রেসি প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী। ১৯৭৫ সালে দেশে জরুরি অবস্থা জারি করিয়া বিরোধীশূন্য লোকসভায় সংবিধানের প্রস্তাবনায় 'সেকুলার' ও 'সোস্যালিস্ট' শব্দদুইটি যুক্ত করিয়াছেন। তাঁহার এইপ্রকার কার্য সংবিধান প্রণেতাদের চিরন্তন ভারত ভাবনার উপর কুঠারাঘাতস্বরূপ। ভারতবর্ষ চিরকাল সর্বধর্ম সমভাব নীতি লইয়া চলিয়াছে। ইহা ভারতবর্ষের প্রকৃতি। ভারতবর্ষের রাজা তাহার প্রজাদের জন্য সর্বস্ব বিলাইয়া দিয়াছেন, ইহাও ভারতবর্ষের প্রকৃতি ও নীতি। স্বভাবতই সংবিধান প্রণেতাগণ পৃথকভাবে সেই কথা সংবিধানে লিপিবদ্ধ করিবার প্রয়োজন বোধ করেন নাই। সেকুলার ও সোস্যালিস্ট শব্দদুইটির অনুপ্রবেশ ঘটাইয়া কংগ্রেস ভারতের জনগণের মনে ভেদবুদ্ধির বীজ বপন করিয়াছে। এইকথা সত্য যে, সংবিধান প্রণয়নের বহু বৎসর অতিবাহিত হইলেও এখনও পর্যন্ত দেশে জাতপাত ও বৈষম্যমূলক সমস্যাগুলি অতিমাত্রায় সক্রিয় রহিয়াছে। ভারতবাসীর সৌভাগ্য যে, বর্তমান কেন্দ্রীয় সরকার দীর্ঘদিনের লালিত ও বর্ধিত বিভেদ বুদ্ধির অবসান ঘটাইয়া এক জাতি এক প্রাণ করিবার প্রচেষ্টা করিয়া চলিয়াছে। তাহাতে বহুলাংশে সফলও হইয়াছে। সাধারণতন্ত্র দিবস বারবার আসে, সাড়ম্বরে উদ্‌যাপিত হয়, কিন্তু সংবিধান বিষয়ে দেশবাসীর আরও প্রশিক্ষিত হইবার প্রয়োজন রহিয়াছে।

সুভাষিতম্

তাবজ্জিতেন্দ্রিয়ো ন স্যাদ্বিজিতান্যেন্দ্রিয়ঃ পুমান্।
ন জয়েদ্রসনাং যাবৎ জিতং সর্বং জিতে রসে।। (ভাগবত-১১/৮/২১)

অন্য সকল ইন্দ্রিয় বশীভূত হলেও যতক্ষণ পর্যন্ত রসনা জয় না হয়, ততক্ষণ জিতেন্দ্রিয় হওয়া যায় না। রসনেন্দ্রিয় জয় হলে সব ইন্দ্রিয়ই জয় করা সহজ হয়।

বিদেশি বাম আর পুরোনো কংগ্রেসি দুষ্কৃতীদের তোল্লা দিচ্ছে তৃণমূল

‘হাঁটি হাঁটি পা পা...’

নির্মাল্য মুখোপাধ্যায়

শিশুদের হাঁটা শেখাতে এ রাজ্যের মায়েরা ছড়া কাটেন–- ‘হাঁটি হাঁটি পা পা খোকন হাঁটে দেখে যা’। নরেন্দ্র মোদী হটাও কর্মসূচিতে দেশ আর রাজ্য জুড়ে বিরোধীদের হাঁটাহাঁটি চলছে। শক্ত আসনে বসে থাকা মোদীকে সরাতে হাস্যকরভাবে কংগ্রেস হাঁটছে। হাঁটু ব্যথা হয়ে যাচ্ছে কিন্তু মোদী সরছে বা নড়ছে না। রাহুল গান্ধী আবার পদযাত্রা চালু করছেন। পশ্চিমবঙ্গের ভিতর দিয়ে মণিপুর থেকে মুম্বই। বঙ্গীয় সংস্করণ দলের রাজ্য সভাপতি অধীর চৌধুরী সাগর থেকে পাহাড় যাত্রা করেছিলেন। মমতা আর মোদীকে সরাতে যাত্রা করেছিলেন অধীর। মমতার রাজনৈতিক চালের গুঁতোয় নিজেই পপাত ধরণীতলে।

রাজনৈতিকভাবে অপ্রাপ্তবয়স্ক মীনাক্ষী মুখোপাধ্যায় বিদেশি সিপিএমের যুবনেত্রী। হেঁটে ব্রিগেডে পৌঁছেছেন। মহাশূন্যে মিলিয়ে যাওয়া বামেদের হয়ে পতাকা ওড়াচ্ছেন। একরত্তি কন্যার হাত ধরে ক্ষমতার কল্পলোকে ভাসতে শুরু কছে বামেরা। মমতার পুলিশ আর তৃণমূলের অনেক অবদান। তাদের সহায়তা ছাড়া মীনাক্ষীর সমাবেশ যে সুষ্ঠুভাবে হতো না শিশুরাও তা বোঝে। ওটাকে তৃণমূলের ‘বি-টিম’ সমাবেশ বলাই ভালো।

মমতা প্রধান শত্রু মনে করেন বিজেপিকে। বাম আর কংগ্রেস অপ্রধান। বিজেপিকে সামলাতে মমতা তাদের কাজে লাগান। মমতার আবেদনে সিলমোহর দেয় কংগ্রেস হাইকমান্ড। পাশে বসে চা পান করেন সিপিএমের সাধারণ সম্পাদক। ২০২১-এর রাজ্য নির্বাচনে চার শতাংশ ভোট পেয়েছিল সিপিএম। খুদের কুড়োটাও কেড়ে নিতে চান মমতা। বিজেপির ঠেকায় পড়ে সিপিএমের মতো দুষ্কৃতীদের দল (মমতার মতে)-কে মমতা কাজে লাগাচ্ছেন। তা শেষ হলেই সিপিএম চলে যাবে ইতিহাসের আস্তাকুঁড়ে। দলের পক্ককেশ নেতারা নিরুপায়। সব শীতঘুমে। তৃণমূলের যুবকদের মতো তাদের সুখের পায়রার খোপে হানা দিয়েছে মীনাক্ষী, দীপ্সিতা, ঐশী আর শতরূপদের দল। মমতার পুরোনো সঙ্গীদের ছেঁটে বৃদ্ধতন্ত্রকে উপড়ে ফেলতে উদ্যত অভিষেক।

লোকসভা ভোটে বিদেশি সিপিএমের দু’শতাংশ ভোট কমলে অবাক হব না। লোকশক্তির মিথ্যা আস্ফালন বজায় রাখতে বাম বিদেশিরা কিছু সদ্যোজাত নামিয়েছে। মুখপত্র নিশ্চুপ। শুনেছি রাহুল-মীনাক্ষীর পাশাপাশি অভিষেকও হাঁটি হাঁটি পা পা যাত্রা শুরু করবেন। দেশের সতেরোটি রাজ্যের শক্তপোক্ত চেয়ারে বসে আছে মোদীর দল। তাঁকে হঠাতে সবাই গান্ধী যাত্রা শুরু করেছে। বলতে খারাপ লাগছে মূর্খের দল বোঝে না ১৯৪৭-এর আগে মোহনদাস গান্ধী পদযাত্রা করতেন বিদেশি হটাতে। এখন বামেরা তেমন বিদেশি।

> **“তৃণমূলের দুষ্কৃতীকরণ মমতার অবদান। দলের পেট থেকে রোজ নতুন দুষ্কৃতী জন্মাচ্ছে। নতুনদের সঙ্গে পুরোনো দুষ্কৃতী সিপিএমকেও শরিক করেছে মমতা। হিন্দুত্ব এতটাই শক্তিশালী যে তা আটকাতে মমতাকে দুষ্কৃতী সম্মেলন করতে হচ্ছে।”**

মোদী ভারতের মানুষ। এই মুহূর্তে তিনি বিশ্বের সবচেয়ে জনপ্রিয় নেতা। বিজেপির মোট ভোটের বিশ শতাংশ মোদীকে সামনে রেখে। হিন্দুরা সহনশীল জাতি। সেই ভদ্রতাকে দুর্বলতা ধরে নিয়ে সুযোগ নেয় কিছু দেশ বিরোধী আর জিহাদি শক্তি। ইন্ডিজোট নামে ২৭ দলের একটি নরেন্দ্র মোদী বিরোধী জোট তৈরি হয়েছে। তারা এনডিএ জোটকে ‘আন্ডা’ বলে ডাকে। রাজনৈতিক লড়াইয়ের ময়দানে এ পর্যন্ত তারা অশ্বডিম্ব প্রসব করেছে। পাটনায় জোট তৈরির পর থেকে তাদের ভরাডুবি হয়েছে। ছত্তিশগড়, মধ্যপ্রদেশ আর রাজস্থানে বিজেপি এই জোটকে ধরাশায়ী করে দিয়েছে। মাজা ভাঙা ইন্ডিজোটের গুরু কংগ্রেস দিশাহারা হয়ে পড়েছে। পশ্চিমবঙ্গ, কেরালা, পঞ্জাব, মহারাষ্ট্র আর উত্তরপ্রদেশে জোটের ভগ্নদশা।

গত লোকসভা ভোটে ৪২৩ আসনে লড়ে কংগ্রেস জিতেছিল ৫২ আসন। বিজেপির বিরুদ্ধে জয় মাত্র ১৬ আসনে। বাকি ৩৬ আসন অবিজেপি রাজ্য থেকে। এবার হার নিশ্চিত বুঝে কেবলমাত্র ২৫৫ আসনে লড়বে তারা। তৃণমূলের দুষ্কৃতীকরণ মমতার অবদান। দলের পেট থেকে রোজ নতুন দুষ্কৃতী জন্মাচ্ছে। নতুনদের সঙ্গে পুরোনো দুষ্কৃতী সিপিএমকেও শরিক করেছেন মমতা। হিন্দুত্ব এতটাই শক্তিশালী যে তা আটকাতে মমতাকে দুষ্কৃতী সম্মেলন করতে হচ্ছে। একসময় যাদের গ্রেপ্তারি চাইত মমতা যেমন কংগ্রেস নেতা অধীর চৌধুরী আজ তাদের নৌকায় ভাসছেন মমতা। মমতার ‘ইনডোর’ রাজ্য তৃণমূল আর ‘আউটডোর’ ইন্ডিজোট। তৃণমূল ভিতরে আর ইন্ডি বাইরে লড়বে। হাঁটি হাঁটি পা পা— মানুষ দেখছে খোকারা কেমন হেঁটে যায়। লোকসভা ভোট তার পরীক্ষা। □

বাণিজ্যে বসতে মোদী দিদি বসতে চপশিল্পে

সত্যবাদীষু দিদি,

শীতের শুভেচ্ছা দিদি। ভাইপোর সঙ্গে বসে কি পিঠেপুলি খেতে পারলেন? তিনি তো আপনাকে চ্যালেঞ্জ করে আলাদা সরকার চালাচ্ছেন দিদি। সেসব কথা থাক, আপনাকে একটা কথা বলি, আমি কিন্তু আপনর সব কথাই বিশ্বাস করি। সেই বাণিজ্য সম্মেলনে যখন মুকেশ আম্বানি বললেন যে কালীঘাট মন্দির সংস্কারের জন্য তিনি বড়ো অঙ্কের টাকা বিনিয়োগ করছেন স্ত্রী নীতা আম্বানির কথায় তখন আপনি পাশে বসে হাসি মুখে হাততালি দিচ্ছিলেন। আমি আপনার হাসি এবং আম্বানির কথাকে বিশ্বাস করেছিলাম। আবার এই সেদিন রামজন্মভূমিতে মন্দির তৈরির পালটা দিতে গিয়ে আপনি যখন বললেন যে, 'কালীঘাটে কিন্তু রিলায়্যান্স একা কাজ করছে না। আমরা সেখানে ১৬৫ কোটি টাকা খরচ করেছি। ওদের খরচ হচ্ছে ৩৫ কোটি টাকা।' আমি বিশ্বাস করেছি। কারণ, আমার দিদি সব সত্যি বলেন।

দিদি, সেদিন আপনি এটাও বলেছেন যে 'কালীঘাটে হকার সরিয়ে সব দিক বজায় রেখে মন্দির সংস্কারের কাজটি করানো হচ্ছে। আমি মেয়রকে (ফিরহাদ হাকিম) বলব, দ্রুত যেন সেই কাজ শেষ হয়। পুলিশকেও সহযোগিতা করতে বলব।' কালীঘাটে মন্দির সংস্কারের কাজ অনেকটাই এগিয়েছে বলে জানান আপনি। আশা প্রকাশ করেন যে, পয়লা বৈশাখের আগেই নতুন রূপে কালীঘাটের মন্দির তৈরির কাজ শেষ হবে। তখন তো ভোটের একেবারে মুখে মুখে। সেই দিনটা আপনার ঘোষণা করা 'পশ্চিমবঙ্গ দিবস'। খুব ঘটা হবে নিশ্চয়ই। তখন কি আপনি সেটাকে 'ভোটের গিমিক' বলবেন? এখন যেমন রামমন্দির নিয়ে বললেন! তা ছাড়া দিদি, রামমন্দির কিন্তু সরকারের টাকায় হচ্ছে না। জমিও সরকারের নয়। সাধারণ ভক্তদের পয়সায় হচ্ছে। কারণ, আমি বিশ্বাস করি সরকারি সহযোগিতা থাকতে পারে কিন্তু মন্দির নির্মাণ সরকারের কাজই নয়। তবে দিদি আজকের চিঠিতে আপনাকে যেটা আসলে বলতে চাই সেটা শিল্প এবং শিল্পপতিদের নিয়ে। ক'দিন আগেই একটা সভায় গিয়েছিলাম। সেখানে আলোচনা হচ্ছিল দেশের শিল্পপতিরা প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী অর্থাৎ বিজেপি সরকারকে কেন এত পছন্দ করে? এক কথায় উত্তরটা ছিল— 'বাণিজ্যে বসতে মোদী'। বলা হচ্ছিল কেন্দ্রের এই সরকার এমন কিছু পদক্ষেপ করেছে, যা তাঁদের ব্যবসার সহায়ক। যেমন, দেশীয় উৎপাদকদের ভিন্‌দেশি আমদানির গ্রাস থেকে বাঁচাতে কর্পোরেট ট্যাক্সের মাত্রা কমিয়ে রাখা হয়েছে। আবার শুল্ক ও শুল্ক-বহির্ভূত সুরক্ষা দেওয়া হয়েছে। পাশাপাশি, পরোক্ষ করের ক্ষেত্রে সংস্কার আনা হয়েছে। লগ্নির ক্ষেত্রে ভরতুকির প্রস্তাব রাখা হয়েছে এবং উৎপাদন বাড়ানোর লক্ষ্যে ইনসেনটিভও দেওয়া হয়েছে। এবং বাস্তব পরিকাঠামোর মানোন্নয়নের ক্ষেত্রে অভাবনীয় রকমের সরকারি বিনিয়োগও সম্ভব হয়েছে। সুতরাং সমালোচনার অবকাশ ঠিক কোথায়? কিন্তু দিদি গোটা ভারতের এই চেহারার সঙ্গে পশ্চিমবঙ্গের কেন মিল নেই বুঝতে পারছেন! ঠিকই ধরেছেন, এত দুর্নীতি আর গাজোয়ারি দেখতে চান না শিল্পপতি ও ব্যবসায়ীরা।

মোদী সরকার নিয়ে ব্যবসায়ীদের নজরে যা ধরা পড়ছে, তা হলো— এই সরকার স্থায়িত্ব এবং ধারাবাহিকতার প্রতিশ্রুতি দিচ্ছে। পূর্ববর্তী জোট সরকারের আমল যা যা সব আপনারা করেছেন তার পুনরাবৃত্তি কেউই চান না। নির্বাচনের পরে অ-বিজেপি সরকার গঠনের যে ক্ষীণতম সম্ভাবনার দিবাস্বপ্ন দেখা যাচ্ছে, তাও কিছুতেই তাঁদের কাঙ্ক্ষিত নয়। মনমোহন সিংহ সরকারের শেষ দিকের বছরগুলিতে নীতিনির্ধারণ নিয়ে যে রকম গোলযোগ দেখা দিয়েছিল, তা কেউই চান না। যদি 'রাজস্ব-সন্ত্রাস' নিয়ে কথা ওঠে, তাহলে কংগ্রেস জমানার চেয়ে মোদীর আমলে তার মাত্রা কম কি না, এমন প্রশ্ন জাগলে অন্য একটি বিষয়ের দিকে নজর ফেরাতে হয়। কংগ্রেসের তরফে সাম্প্রতিক যে বার্তা দেওয়া হচ্ছে, তা প্রাথমিকভাবে গণকল্যাণমুখী এবং বিনা পয়সায় জিনিসপত্র পাইয়ে দেওয়ার প্রতিশ্রুতিতে ভরপুর। এ থেকে এমন ইঙ্গিতই স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে, রাজকোষ তেমন ক্ষেত্রে দায়ভার বহন করবে না। সে অর্থে বাণিজ্যমুখী কোনও বার্তা এখনও পর্যন্ত কংগ্রেস দেয়নি। জোটের ভবিষ্যৎ বলে কিছু নেই। কিন্তু দিদি সত্যি করে বলুন তো আপনার দলের মতো যেসব আঞ্চলিক দল রয়েছে তাদের কি আদৌ কোনও বিদেশি নীতি বা জাতীয় স্তরের অর্থনৈতিক ভাবনা থাকতে পারে? আছে কি! কেন থাকবে? রাজ্য চালাতে তো ও সব লাগে না।

মোদ্দা কথায়, ব্যবসায়ীরা চান তাঁদের ব্যবসার উন্নতি হোক। তাঁরা অনিশ্চয়তাকে প্রশ্রয় দিতে চান না। কারণ, তাতে ঝুঁকি বাড়ে। ফলে দিদি, রাজ্য নিয়েই সুখে থাকুন। রক্ষা করার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করে যান। যতই রাজধানী, দুরন্ত এক্সপ্রেস থাকুক না কেন দিল্লি অনেক দূর। □

অতিথি কলম

পীযূষ গোয়েল

‘মেড ইন ইন্ডিয়া’ একটি গুণমান নির্দেশক চিহ্ন

শ্রেষ্ঠ গুণমানসম্পন্ন পণ্যের সহজপ্রাপ্যতার সুবিধা লাভ স্বাধীনতার এই অমৃতকালে প্রতিটি ভারতীয় নাগরিকের অধিকার। জনস্বাস্থ্য সুরক্ষিত রাখার ক্ষেত্রে স্বাস্থ্য সচেতনতার দৃষ্টিকোণ থেকে কিউসিও-র বিষয়টি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ।

উন্নত মানের পণ্য সরবরাহের লক্ষ্যে ভারত বর্তমানে ব্রতী হয়েছে, যে পণ্যসমূহ সর্বোচ্চ বিশ্বমান পূরণে সক্ষম। পণ্য উৎপাদন বা ম্যানুফ্যাকচারিং-ধর্মী শিল্পের বিকাশের উদ্দেশ্যে ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর ‘জিরো ডিফেক্ট-জিরো এফেক্ট’ শীর্ষক আহ্বানের সঙ্গে যা সঙ্গতিপূর্ণ।

২০৪৭-এর মধ্যে ভারতকে একটি উন্নত দেশে পরিণত করার উদ্দেশ্যে প্রধানমন্ত্রীর পক্ষে গৃহীত জাতীয় সংকল্পের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ অংশ হলো প্রতিযোগিতামূলক হারে, উচিত মূল্যে উচ্চ গুণমানসম্পন্ন পণ্য সরবরাহ। ‘মেড ইন ইন্ডিয়া’ ব্র্যান্ডটি উন্নত গুণমান নির্দেশক একটি সূচক, যার ফলশ্রুতিতে ভারতে উৎপাদিত পণ্যসমূহের মানে ভারতীয় ও বিদেশি উভয় প্রকার গ্রাহক ও উপভোক্তারা সন্তুষ্ট। এই ‘মেড ইন ইন্ডিয়া’ ব্র্যান্ডটির মাধ্যমে গ্রাহক সন্তুষ্টির লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের উদ্দেশ্যে ভারত সরকার একাধিক দৃঢ় ও নির্ণায়ক পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে।

সবার স্বার্থ যেখানে সুরক্ষিত : উৎপাদক ও উপভোক্তা— উভয়ের স্বার্থের ভারসাম্য রক্ষিত হলে একটি লাভজনক বাজার দীর্ঘস্থায়ী হতে পারে— অর্থনীতির এই দৃষ্টিকোণটির উপর প্রধানমন্ত্রী বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছেন। পণ্যসমূহের গুণমান নিয়ন্ত্রণ সংক্রান্ত কেন্দ্রীয় সরকারি আদেশ বা কোয়ালিটি কন্ট্রোল অর্ডার্স (কিউসিও) হলো এই কৌশল বা স্ট্র্যাটেজিটির মূল ভিত্তি, যে নির্দেশ মোতাবেক নির্দিষ্ট পণ্যসমূহের গুণমান ব্যুরো অব ইন্ডিয়ান স্ট্যান্ডার্ডস্ (বিআইএস) নির্ধারিত নিয়মাবলী অনুযায়ী বজায় থাকে। এই পদ্ধতিটি উপভোক্তা ও ব্যবসায়িক উদ্যোগ— উভয়ের ক্ষেত্রেই একটি আশীর্বাদস্বরূপ। ক্রেতা বা গ্রাহকরা এর দ্বারা নির্ভরযোগ্য, নিরাপদ ও উচ্চ মানের পণ্য লাভের বিষয়ে আশ্বস্ত হতে পারেন। তেমনই দেশীয় ও আন্তর্জাতিক বাজারের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ক্রেতা ও সচেতন উপভোক্তাদের ক্রমবর্ধমান চাহিদা মোকাবিলায় ব্যবসায়িক উদ্যোগগুলিও হয়ে ওঠে পারঙ্গম।

গ্রাহক মনস্তত্ত্ব : ‘ডিজিটাল ইন্ডিয়া ইনিশিয়েটিভ’-এর মাধ্যমে ১৪০ কোটি ভারতীয় সমগ্র পৃথিবীর সঙ্গে যুক্ত হয়েছেন, উন্নত মানের পণ্য ও তার ব্যবহারের সঙ্গে পরিচিত হয়েছেন। এই ভারতীয় গ্রাহকরা কোনো পণ্য ক্রয়ের আগে তার ব্যবহারযোগ্যতা, তার গ্রহণযোগ্যতা এবং তা টেকসই কিনা সেই বিষয়গুলি ওই পণ্য সম্পর্কিত ‘গ্রাহক পর্যালোচনা’ বা কাস্টমার রিভিউ দেখে নিয়মিত যাচাই করে নেন। কোনো পণ্য ব্যবহারে অসন্তুষ্ট হলে তারা সেই পণ্য সংক্রান্ত ত্রুটিগুলি প্রকাশ্যে তুলেও ধরেন। অতএব, সময়ের দাবি মেনে পণ্যের গুণমান, দাম ও পণ্য উৎপাদনের লক্ষ্যে উদ্ভাবনী প্রয়োগের মধ্যে সাযুজ্য ও ভারসাম্য বজায় রাখার বিষয়টি অতীব গুরুত্বপূর্ণ।

গুণমান রক্ষাসূচক নেটওয়ার্কের প্রসার ও বিস্তার : নিরাপদ, নির্ভরযোগ্য, উন্নত মানের পণ্য সরবরাহ এবং ভারতে উৎপাদিত দ্রব্য ও পণ্যসমূহের রপ্তানির সম্প্রসারণের উদ্দেশ্যে একটি শক্তিশালী পরিচালন তন্ত্র বা ইকোসিস্টেম গড়ে তোলার লক্ষ্যে নরেন্দ্র মোদী নেতৃত্বাধীন কেন্দ্রীয় সরকার মনোনিবেশ করেছে। ২০১৪-র মে মাসের আগে ১০৬টি পণ্য সম্পর্কিত ইস্যু হওয়া কিউসিও-র সংখ্যা ছিল মাত্র ১৪। বর্তমানে সেই তালিকাটি প্রসারিত হয়ে, ৬৫৩টি পণ্য সংবলিত ১৪৮টি কিউসিও-সম্পন্ন একটি তালিকায় পরিণত হয়েছে। এয়ারকন্ডিশনার (এসি), খেলনা, ফুটওয়্যার (জুতো)-এর মতো গৃহস্থালীতে নিত্য ব্যবহৃত পণ্যসমূহ এই তালিকার অন্তর্ভুক্ত।

রপ্তানিযোগ্য গুণমান অর্জন : ‘মেক ইন ইন্ডিয়া ফর দ্য ওয়ার্ল্ড’ (অর্থাৎ, বৈশ্বিক প্রয়োজন মেটাতে ভারতে পণ্য উৎপাদন ও বিপণন) প্রকল্প ত্বরান্বিত করতে ভারত সরকার দ্বারা জারি এই কিউসিও সমূহ মুখ্য ও অগ্রণী ভূমিকা গ্রহণ করেছে। কিউসিও-র অধীনে তালিকাভুক্ত একাধিক পণ্য বর্তমানে বিদেশে রপ্তানি হচ্ছে। কাস্ট আয়রন প্রোডাক্ট বা ছাঁচে ঢালা লোহার পণ্য, সোলার ডিসি কেবল্, ডোর ফিটিংস্, সিলিং ফ্যান (ইলেকট্রিক পাখা), হেলমেট, স্মার্ট মিটার, হিঞ্জেস বা কলকবজা, এয়ার কুলার (বাতানুকূল যন্ত্র) ও এয়ার ফিল্টারের মতো গুণমান নিয়ন্ত্রিত পণ্য (কোয়ালিটি কন্ট্রোল্ড প্রোডাক্ট) এখন আমদানির চেয়ে উচ্চ হারে রপ্তানি হচ্ছে। কিউসিও-র দ্বারা নির্ধারিত গুণমানসম্পন্ন ঢালাই লোহার তৈরি পণ্যের রপ্তানি গত বছরে ছুঁয়েছে ৫৩৫ মিলিয়ন ডলার, যেখানে তার আমদানির পরিমাণ ছিল ৬৮ মিলিয়ন ডলার। প্রায় ২৫টি কিউসিও সেই পণ্যগুলির ক্ষেত্রে প্রযুক্ত যে পণ্যগুলির

রপ্তানির অঙ্ক ইতিমধ্যেই তাদের আমদানির পরিমাণকে অতিক্রম করেছে।

গুণমানই নিরাপত্তার উৎস : এটা স্পষ্ট যে ভারত সরকার দ্বারা নির্দেশিত কিউসিও সমূহ দেশব্যাপী ব্যাপক গুণমান সচেতনতা বিকাশে একটি সক্রিয় ও কার্যকরী ভূমিকা গ্রহণ করেছে। এই প্রক্রিয়াটি দেশে নিম্নমানের পণ্যের মজুত ভাণ্ডার তৈরির প্রবণতা বা ডাম্পিং প্রতিরোধেও সহায়ক। শ্রেষ্ঠ গুণমানসম্পন্ন পণ্যের সহজপ্রাপ্যতার সুবিধা লাভ স্বাধীনতার এই অমৃতকালে প্রতিটি ভারতীয় নাগরিকের অধিকার। জনস্বাস্থ্য সুরক্ষিত রাখার ক্ষেত্রে স্বাস্থ্য সচেতনতার দৃষ্টিকোণ থেকে কিউসিও-র বিষয়টি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। পরিবার ও গৃহস্থালীর পক্ষে নিম্নমানের পণ্য বিপজ্জনক। সস্তার ইলেক্ট্রনিক সামগ্রী ব্যবহারের কারণে অগ্নিকাণ্ড, বৈদ্যুতিন / ইলেক্ট্রিকাল শর্ট-সার্কিটের মতো বিপর্যয়, বা খেলনায় ক্ষতিকর, বিষাক্ত রাসায়নিক পদার্থ (টক্সিক কেমিকালস্) ব্যবহারের ফলে শিশুদের অসুস্থতা, আক্রান্ত শিশুদের হাসপাতালে ভর্তির মতো ঘটনা তার প্রমাণ।

গুণমান নিয়ন্ত্রণ : উৎপাদন শিল্পের উন্নয়নের পক্ষে গুণমান নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থাটি (কোয়ালিটি কন্ট্রোল) সত্যিই অনবদ্য। এই ব্যবস্থা ক্রেতা ও উৎপাদনকারী— উভয়ের পক্ষেই লাভজনক। এর একটি প্রকৃষ্ট উদাহরণ হলো— খেলনা শিল্প। কিউসিও পদ্ধতি রূপায়ণ এবং তার এই ব্যাপক বাস্তবায়নের আগে সস্তা, অতি নিম্নমানের পণ্যে ভারতীয় খেলনা শিল্পের বাজার ছেয়ে গিয়েছিল। ২০১৯-এ কোয়ালিটি কাউন্সিল অব ইন্ডিয়ার একটি সমীক্ষা অনুযায়ী, বাজার চলতি খেলনার মাত্র এক-তৃতীয়াংশ নির্দিষ্ট বিআইএস নিয়মাবলী মেনে তৈরি। তাদের অধিকাংশই শিশুদের পক্ষে ক্ষতিকর ও বিপজ্জনক। এহেন ঘটনা ছিল সত্যিই অসহ্য। ২০২১-এর পয়লা জানুয়ারি এই সংক্রান্ত একটি কিউসিও জারি করে ভারত সরকার পদক্ষেপ গ্রহণ করে। খেলনা শিল্পের ক্ষেত্রটিকে কিউসিও-র অধীনে আনার দরুন খেলনা জাতীয় দ্রব্যের গুণমানও বৃদ্ধি পায়। একটি সাম্প্রতিক সমীক্ষায় প্রকাশ ভারতীয় বাজারে বিক্রীত ৮৪ শতাংশ খেলনা বিআইএস নিয়মাবলীর অনুবর্তী। কিউসিও-র প্রয়োগের মাধ্যমে ভারতীয় শিশুদের জন্য নিরাপদ, উচ্চমানের খেলনা উৎপাদন সম্ভব হওয়া ছাড়াও ২০১৮-'১৯-এর তুলনায় ২০২২-'২৩-এ ভারতীয় খেলনা রপ্তানি বৃদ্ধি পেয়েছে ৬০ শতাংশ।

গৃহস্থালীতে সুনিশ্চিত হয়েছে গুণমানসম্পন্ন পণ্যের জোগান : গৃহস্থালীতে ব্যবহারযোগ্য ভোগ্যপণ্য ও অন্যান্য দ্রব্য-সামগ্রীর ওপরেও প্রযুক্ত হয়েছে একাধিক নিয়মাবলী। এই নিয়ম-কানুনের অধীনে রয়েছে— স্মার্ট মিটার, নাট-বোল্ট-ফাস্টেনার, সিলিং ফ্যান, অগ্নি নির্বাপক যন্ত্র (ফায়ার এক্সটিঙ্গুইশার), রান্নার সামগ্রী (কুকওয়্যার), বাসনকোসন (ইউটেন্সিলস্), জলের বোতল, পাইপ-বাহিত প্রাকৃতিক গ্যাস দ্বারা রান্নায় ব্যবহৃত ডোমেস্টিক গ্যাস স্টোভ, কাঠ নির্মিত বোর্ড, ইন্সুলেটেড ফ্লাস্ক, ইন্সুলেটেড কন্টেনারের মতো গৃহস্থালীতে প্রয়োজনীয় পণ্যসমূহ।

কিউসিও জারি ও সেগুলি প্রয়োগের আগে এই ক্ষেত্রের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সব পক্ষ (স্টেকহোল্ডার) ও শিল্পসংস্থাগুলির প্রতিনিধিদের সঙ্গে আলোচনাক্রমে, তাদের তরফে আসা এই সংক্রান্ত প্রতিক্রিয়া (ফিডব্যাক), প্রযুক্তিগত পরামর্শ (টেকনিকাল ইনপুট) ও অন্যান্য পরিকল্পনা সংগৃহীত হয়ে সেগুলির সব রকম পর্যালোচনা কেন্দ্রীয় সরকার নিয়মিতভাবেই করে থাকে। ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প ইউনিট গুলির সুরক্ষায় তাদের জন্য অপেক্ষাকৃত দীর্ঘ অবস্থান্তরকালীন সময় (ট্রানজিশন পিরিয়ড) বরাদ্দ হয়ে থাকে। প্রতিযোগিতামূলক ক্ষেত্রে শিল্পগুলিকে আরও দক্ষ করে তোলা এবং পণ্য উৎপাদকদের সহায়তা প্রদানের মাধ্যমে উৎপাদিত পণ্যসমূহের গুণমান বৃদ্ধির লক্ষ্যে ভারত সরকার সদা প্রয়াসী।

প্রশাসনিক গুণমান দ্বারা সুনিশ্চিত সুশাসন : বৈশ্বিক মানে দেশীয় পণ্যসামগ্রীসমূহকে উন্নীত করার মতো মহতী উদ্যোগটি হলো ১৪০ কোটি ভারতবাসীর জীবনযাত্রার মানোন্নয়নের লক্ষ্যে প্রধানমন্ত্রীর পক্ষে গৃহীত একটি দৃষ্টিভঙ্গী। উন্নত দেশ গঠনের লক্ষ্যে তাঁর স্বপ্ন বাস্তবায়নের পথে ভারতীয়দের আশা-আকাঙ্ক্ষা পূরণে ধারাবাহিক পদক্ষেপ গ্রহণের মাধ্যমে সকলের জন্য অন্ন-বস্ত্র-বাসস্থানের সঙ্গে স্বাস্থ্য-পরিষেবা ও উন্নত পরিকাঠামোর সংস্থানে তিনি ব্রতী হয়েছেন। তাঁর দ্বারা দুর্নীতি-মুক্ত, জনদরদি প্রশাসন পরিচালনায় ত্বরান্বিত হয়েছে আর্থিক বৃদ্ধি, মুদ্রাস্ফীতি হয়েছে নিয়ন্ত্রিত, বিশ্বব্যাপী প্রকাশিত হয়েছে ভারতের খ্যাতি ও প্রসিদ্ধি। গত ৫ বছরে প্রায় সাড়ে ১৩ কোটি মানুষ দারিদ্র্যের অন্ধকার থেকে মুক্ত হয়েছেন।

স্বকীয় গুণমানে প্রতিটি ভোট গুরুত্বপূর্ণ : বিভিন্ন রাজ্যের সাম্প্রতিক বিধানসভা নির্বাচনগুলিতে ভোটদানের মাধ্যমে আমজনতা--- প্রধানমন্ত্রীর দ্বারা পরিচালিত উচ্চমানের প্রশাসনিক ব্যবস্থার প্রতি তাদের সমর্থন জানিয়েছেন। ভারতীয় উৎপাদন শিল্পক্ষেত্রের পরিচালকদের প্রতিও এই নির্বাচন ও তার ফলাফল একটি জোরালো ও সদর্থক বার্তা বহন করছে। যখন মানুষ তাদের প্রদত্ত ভোট কিংবা ওয়ালেট (মানিব্যাগ)-এর বিনিময়ে কোনো কিছু বেছে নেয়, স্বাভাবিক ভাবেই তারা সর্বোচ্চ গুণমানকেই চয়ন করে থাকে। তাই এহেন মতদান, অর্থাৎ প্রতিটি ভোট— সব কিছুর গুণমান সুনিশ্চিত করার লক্ষ্যে ভোটদাতাদের নিজস্বতার গুণেও গুণান্বিত। লেখক ফিলিপ ক্রসবি তাঁর রচিত 'কোয়ালিটি ইজ ফ্রি' বইতে তাই যথার্থই লিখেছেন— 'If you're out of quality, you're out of business.' (যদি কেউ গুণহীন হয়, তবে সে সম্পূর্ণ গুরুত্বহীন/অপ্রাসঙ্গিক/নিষ্কর্মা!)

(লেখক কেন্দ্রীয় শিল্প ও বাণিজ্যমন্ত্রী)

বিজ্ঞপ্তি

স্বস্তিকার যে সকল বার্ষিক গ্রাহকের মেয়াদ শেষ হয়েছে বা শেষ হতে চলেছে তাঁদের কাছে বিনীত নিবেদন, আপনারা পরবর্তী বছরের জন্য গ্রাহকমূল্য ৭০০ টাকা অবিলম্বে জমা দিয়ে গ্রাহকপদ নবীকরণের মাধ্যমে আমাদের সহযোগিতা করুন। স্বস্তিকার প্রতিনিধির মাধ্যমেও টাকা পাঠাতে পারেন।

নতুন গ্রাহক হলে সম্পূর্ণ নাম- ঠিকানা, ফোন নম্বর (পিন কোড সহ) অবশ্যই পাঠাবেন।

ব্যবস্থাপক, স্বস্তিকা

নেতাজী : কংগ্রেসের উদাসীনতা

নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসুর অন্তর্ধান হয়েছে প্রায় আশি বছর হতে চললো। এখনও সেই অন্তর্ধান রহস্যের কোনো কিনারা হলো না। স্বাধীনতার পর থেকে ৭৬ বছর ধরে ভারতবাসী তাঁকে নিয়ে রাজনীতিই দেখে গিয়েছে। একথা বুঝতে অসুবিধা হয় না, তিনি ফিরে এলে কাদের অসুবিধা হতো। দেশবাসী এও জানে, যাঁরা দেশের শাসনক্ষমতা স্বাধীনতার পর থেকে সবচেয়ে বেশি সময় ভোগ করেছে, তাঁরা নেতাজীকে ভয় পেত। তাঁর জীবিত অবস্থাতে তো বটেই, তাঁর মৃত্যুর খবর রটানোর পরেও। যতদিন নেতাজীর মেজদা শরৎচন্দ্র বসু জীবিত ছিলেন, তাঁর বিয়ের খবর রটানোর কেউ সাহস করেননি। তাঁর মৃত্যুর পরে শুধু যে বিয়ের খবরই রটলো, তাই নয়, তাঁর কন্যাসন্তানেরও খবর পাওয়া গেল! এর পরিপ্রেক্ষিতে কেউ কেউ বলে থাকেন, কেউ বিয়ে করল মানেই তিনি খারাপ নন। নেতাজীর বিয়ে হলে অসুবিধা কোথায়?

কোনো অসুবিধা নেই, নেতাজী যদি সত্যিই বিয়ে করে থাকেন। কিন্তু তাঁর বিয়ের এমন প্রমাণ হাজির করা হয়েছে, যেগুলি অনায়াসে কৃত্রিম ভাবে তৈরি করা যেতে পারে, বিশেষ করে তাঁর বিবাহের প্রত্যক্ষদর্শী জীবিত যেখানে কাউকে পাওয়া যায়নি, সেখানে তাঁর বিবাহকে প্রত্যক্ষ প্রমাণের অভাবে মানতে অসুবিধা আছে। বিশেষ করে, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধজনিত সেই অশান্ত পরিস্থিতির সুযোগ নিয়ে দেশমাতৃকার পরাধীনতার শৃঙ্খলমোচন করার পরিবর্তে নেতাজী ব্যক্তিগত সুখের জন্য বিয়ে করবেন, এটা ভারতবাসীকে বিশ্বাস করানো শক্ত। ব্রহ্মচারী জীবনের প্রতি দেশবাসীর অকৃত্রিম শ্রদ্ধা, নেতাজী-বিদ্বেষীরা খুব ভালোভাবেই জানতো, তাই তাঁর বিয়ের খবরটা তাঁদের মস্তিষ্কপ্রসূত হওয়ারই সমধিক সম্ভাবনা। নেতাজীর এই কথিত কন্যা, তাঁরও কিন্তু তাঁর আরোপিত পিতৃদেব অর্থাৎ নেতাজীকে নিয়ে

রাজনীতি দৃষ্টিকটু লেগেছে। তিনি অর্থাৎ অ্যানাইটা পাফ কংগ্রেসের বিরুদ্ধে নেতাজীকে যথোচিত সম্মান না দেওয়ার অভিযোগ তুলেছিলেন বছর দুয়েক আগেই জি-মিডিয়াকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে।

অ্যানাইটা পাফ বলেছিলেন, 'কংগ্রেসের একটা অংশ নেতাজীকে ভুল বুঝেছে। আর আমার বাবা যেহেতু বিদ্রোহী প্রকৃতির ছিলেন, তাঁকে নিয়ন্ত্রণ করা গান্ধীজীর পক্ষে কঠিন হতো, তাই তিনি নেহরুর প্রতি ঝুঁকে ছিলেন।' এই সূত্রেই তিনি নেতাজীর প্রতি কংগ্রেসের একটা অংশের উদাসীনতার প্রসঙ্গ তোলেন এবং পাশাপাশি কেন্দ্রের বিজেপি সরকার যে ইন্ডিয়া গেটে নেতাজী-মূর্তি বসিয়েছে, তার প্রভূত প্রশংসাও করেন। মিসেস পাফ এও বলেন যে, পশ্চিমবঙ্গের ভোটের মুখে একটা কমিটির কথা ঘোষণা করা হলো ভোটে মাইলেজ পাওয়ার জন্যে, কিন্তু কাজের কাজ কিছু হয়নি বলেই তাঁর অভিযোগ। নেতাজীর নাম নিয়ে ভারতীয় রাজনৈতিক দলগুলির বহমান রাজনীতিরও সমালোচনা করেন অ্যানাইটা। উক্ত আলাপচারিতায় তিনি ক্ষোভের সঙ্গে জানান, যে দেশের স্বাধীনতালাভের জন্য নেতাজী জীবনপাত করেছিলেন সেই দেশের রাজনৈতিক নেতাদেরই নেতাজীকে নিয়ে করে চলা এই রাজনীতি খুবই অপ্রীতিকর লাগে তাঁর।

নেতাজীর কন্যাকথিত অ্যানাইটা পাফের এই অভিযোগ দেশনেতাদের কর্ণকুহরে বিগত দুই বছরেও প্রবেশ করেনি, করলে দেশবাসী তাঁদের প্রকৃত নেতৃত্বকে সম্মান জানানোর সুযোগ অন্তত পেতেন। অন্যদিকে সম্প্রতি নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসুকে 'জাতীয় সন্তান' ঘোষণা করার জন্য সুপ্রিম কোর্টে এক জনস্বার্থ মামলা করা হয়েছিল। কটকের পিনাকপাণি মহান্তি সুপ্রিম কোর্টে আবেদন করেছিলেন, ব্রিটিশ শাসন থেকে দেশকে স্বাধীন করার লড়াইয়ে নেতাজীর আজাদ হিন্দ ফৌজের যে ভূমিকা তাকে কংগ্রেস সেভাবে গুরুত্বই দেয়নি। এমনকী নেতাজীর অন্তর্ধান বা মৃত্যু সংক্রান্ত সব ফাইল সরিয়ে রাখা হয়েছে। ওই আবেদনে আরও বলা হয়েছিল, কেন্দ্রীয় সরকারের তরফে ২৩ জানুয়ারিকে 'জাতীয় দিবস এবং নেতাজীকে 'জাতীয় সন্তান' হিসেবে ঘোষণা করা হোক। যদিও পিনাকপাণির আর্জি গত নভেম্বরে খারিজ করে দিয়েছে দেশের সর্বোচ্চ আদালত। বিচারপতিদের বেঞ্চ জানিয়ে দিয়েছে, দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে নেতাজীর অবদান অনস্বীকার্য এবং সর্বজনবিদিত। তাই আদালতের যুক্তি, তাঁর মতো এক ব্যক্তিত্বকে 'জাতীয় সন্তান' হিসেবে আদালতের ঘোষণা করার কোনও মানেই হয় না। বিচারপতি সূর্যকান্ত এবং কে ভি বিশ্বনাথনের বেঞ্চের বক্তব্য, 'নেতাজীর মতো নেতাকে কে চেনেন না? দেশের প্রতিটি মানুষ তাঁর অবদান নিয়ে অবগত। তাঁর মাহাত্ম্য প্রমাণ করার জন্য আদালতের ঘোষণার প্রয়োজন নেই। তাঁর মতো নেতারা অমর।'

অ্যানাইটা পাফের বক্তব্য কিংবা পিনাকপাণির মামলা একটা কথাই প্রমাণ করে যে, নেতাজীকে নিয়ে শাসক কংগ্রেসের স্বাধীনতার পর থেকে ছিয়াত্তর বছর ধরে এই উদাসীনতা দেশবাসীর কাছে ক্রমশ অসহ্য হয়ে উঠেছে। এর জবাবদিহি স্বাধীনতার পর দেশের শাসন ক্ষমতায় সবচেয়ে বেশিদিন থাকা শাসক কংগ্রেসকে আজ না হোক কাল, একদিন না একদিন করতেই হবে। □

ভারতীয় গণতন্ত্র— স্বীকৃতি ও বিকৃতি

অংশুমান গঙ্গোপাধ্যায়

১৯২৯ সালে জাতীয় কংগ্রেসের লাহোর অধিবেশনে ১৯৩০ সালের ২৬ জানুয়ারি দিনটিকে ভারতের পূর্ণ স্বাধীনতা বা পূর্ণ স্বরাজ দিবস হিসেবে পালনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। ১৯৪৭ সালের ১৮ জুলাই ইংল্যান্ডে পাশ হয়— 'দ্য ইন্ডিয়ান ইন্ডিপেন্ডেন্স অ্যাক্ট, ১৯৪৭'। এর ফলশ্রুতিতে ১৯৪৭-এর ১৫ আগস্ট মধ্য রাতে ঘোষিত হয় ভারতের স্বাধীনতা। এই স্বাধীন ভারত হলো খণ্ডিত ভারত। এর পেছনে ছিল জাতীয় কংগ্রেস ও মুসলিম লিগের সঙ্গে আলোচনাক্রমে ১৯৪৭ সালের ৩ জুন গৃহীত একটি ষড়যন্ত্রমূলক পরিকল্পনা যা 'মাউন্টব্যাটেন প্ল্যান' নামে পরিচিত। পঞ্জাব ও বঙ্গপ্রদেশকে টুকরো করে জননী-জন্মভূমির অঙ্গচ্ছেদের বিনিময়ে সৃষ্টি হলো স্বাধীন ভারত। কিন্তু ভারতের তদানীন্তন ভাইসরয় তথা গভর্নর জেনারেল লুই মাউন্টব্যাটেন কিন্তু সেই সদ্য স্বাধীন ভারতের গভর্নর জেনারেল পদেই বহাল রইলেন। ১৯৪৮ সালে পাকিস্তান সেনাবাহিনী তাদের উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের কিছু উপজাতিদের নিয়ে কাশ্মীর আক্রমণ করে গোটা কাশ্মীর দখলে উদ্যত হলে ভারতের প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহরু এই গভর্নর জেনারেল মাউন্টব্যাটেনের পরামর্শে এই বিষয়টিকে রাষ্ট্রসঙ্ঘে নিয়ে গেলেন। ভারতীয় সেনাকে যুদ্ধের দ্বারা পাকিস্তানি দখলদারদের হটিয়ে সেই আক্রমণের ফয়সালা করতে দিলেন না। ফলে সৃষ্টি হলো পাক-অধিকৃত কাশ্মীর।

এরপর নানা আলোচনা, তর্ক-বিতর্কের মধ্য দিয়ে ১৯৪৯ সালের ২৬ নভেম্বর ভারতীয় সংবিধান সভাতে সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয় ভারতীয় সংবিধান। ১৯২৯ সালের কংগ্রেস অধিবেশনের সেই ঐতিহাসিক প্রস্তাবনার বাস্তবায়নের লক্ষ্যে ভারতীয় সংবিধানকে কার্যকর করার জন্য ১৯৫০ সালের ২৬ জানুয়ারি দিনটিকেই বেছে নেওয়া হয়। ভারত পরিণত হয় একটি স্বাধীন, সার্বভৌম গণতান্ত্রিক দেশে।

সেই স্বাধীনতার সময় থেকে এই ২০২৪ সালে এসে এক শক্তিশালী ভারত নির্মাণ পর্যন্ত দিনগুলি খুব মসৃণ ছিল না। পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানে সংখ্যালঘু হিন্দু ও শিখদের প্রতি ব্যাপক নির্যাতনের ফলে ভারতে শরণার্থীদের ঢল নামে। ভারতে অন্তর্ভুক্ত জম্মু-কাশ্মীর মুসলমান জনসংখ্যাবহুল একটি রাজ্যে পরিণত হওয়ায় সেখানে জারি করা হয় সংবিধানের ৩৫এ ও ৩৭০ ধারা। এই রাজ্যকে দেওয়া হয় সংবিধানের আওতার মধ্যে এক অদ্ভুত স্বায়ত্ত শাসন। সাংবিধানিক ব্যবস্থার অন্তরালে এই দেশবিরোধী পকিল্পনার বিরুদ্ধে সোচ্চার হলেন ভারত কেশরী ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়। এক দেশে এক বিধান, এক নিশান, এক প্রধানের দাবিতে কাশ্মীরে প্রবেশ করে তাঁর রহস্যজনক মৃত্যু ঘটলো যার কিনারা আজও হয়নি। তাঁর আত্মবলিদানের পরে এই স্বায়ত্ত শাসনের আড়ালে কাশ্মীর জুড়ে চলে অবাধ দুর্নীতি, ভারত বিরোধী জঙ্গি-জেহাদি কার্যকলাপ। মুসলমান সংখ্যাধিক্যের কারণে কাশ্মীরের স্বায়ত্ত শাসনের অধিকারের এই অরাষ্ট্রীয় দাবিকে মেনে নেওয়ার ভয়াবহ ফলাফল হিসেবে ১৯৯০ সালের জানুয়ারি মাসে কাশ্মীর উপত্যকা জুড়ে সংঘটিত হয় বীভৎস, নৃশংস হিন্দু গণহত্যা যার পরিণামে লক্ষাধিক কাশ্মীরি পণ্ডিত উপত্যকা ছেড়ে ভারতের অন্যত্র চলে যেতে বাধ্য হন। দেশের মধ্যে দেশ গঠনের এই ভয়ংকর কাজের পরিণামে তারা হয়ে পড়েন নিজ ভূমে পরবাসী। ১৯৬২-র ভারত-চীন যুদ্ধে প্রধানমন্ত্রী নেহরুর দুর্বল প্রতিরক্ষা নীতির কারণে এবং তাঁর বিদেশ নীতির শোচনীয় ব্যর্থতায় কাশ্মীরের ৩৭ হাজার বর্গমাইল অঞ্চল (আকসাই চীন) চীনের হস্তগত হয়। সংসদে দাঁড়িয়ে নেহরু সাফাই দেন যে সেখানে তো একটা ঘাসও জন্মায় না!

১৯৬৫ সালে ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধের পর ১৯৬৬ সালে তাসখন্দে শান্তি চুক্তি সম্পাদন করতে যান লালবাহাদুর শাস্ত্রী। সেখানে তাঁর রহস্যজনক মৃত্যু ঘটে। তাঁর মৃত্যুর পরে ভারতের প্রধানমন্ত্রী হন নেহরু কন্যা ইন্দিরা গান্ধী। শুরু হয় ভারতীয় রাজনীতিতে গণতন্ত্রের নামে নেহরু-ইন্দিরা-রাজীব হয়ে নেহরু-গান্ধী বংশজদের অধীনে এক অদ্ভুত পরিবারতন্ত্র। বিরোধী কণ্ঠস্বর দমন করে স্বৈরতান্ত্রিক কায়দায় শাসন ক্ষমতা কুক্ষিগত করার লক্ষ্যে ১৯৭৫ সালের ২৫ জুন রাষ্ট্রপতি ফকরুদ্দিন আলি আহমেদকে দিয়ে প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী জারি করেন জরুরি অবস্থা। বিরোধী দলের নেতৃত্ব, কর্মী, সমর্থক সবাইকে জেলে ভরা

> **“এক নতুন ও শক্তিশালী ভারত গঠনের লক্ষ্যে দেশপ্রেমিক জাতীয় সরকার নির্বাচিত হোক ভারতবাসীর লক্ষ্য। বিগত দিনের সমস্ত বিকৃতি মুছে ফেলে প্রকৃত সার্বভৌম ও পরিণত গণতান্ত্রিক দেশ হিসেবে বিশ্বের বুকে ভারতের স্বীকৃতিলাভ হোক ভারতীয় নাগরিকদের ধ্যেয়। ২৬ জানুয়ারি, ২০২৪ হোক সেই শপথ গ্রহণের পবিত্র দিন।”**

ফঃ ২

হয়। সংবাদমাধ্যমের স্বাধীনতা হরণ করা হয়, এমনকী স্বাধীন অবস্থান গ্রহণের কারণের কারণে বহু বরেণ্য সাংবাদিককে জেলবন্দি করা হয়! গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার নামে চলে এক প্রহসন! ১৯৭৭ সাল পর্যন্ত জারি থাকে এই ব্যবস্থা। এই ব্যবস্থার সুযোগ নিয়ে ৪২তম সংবিধান সংশোধনী এনে ভারতীয় সংবিধানের প্রস্তাবনায় 'ধর্মনিরপেক্ষ-সমাজতান্ত্রিক' শব্দ দ্বয়ের সংযোজন ঘটানো হয়। ফলে হিন্দু সংখ্যাধিক্যের দেশ ও ধর্মের দেশ ভারতবর্ষ পরিণত হয় একটি ধর্মনিরপেক্ষ দেশে। মিশ্র অর্থনীতির দেশ হলেও, এমনকী কোনো সমাজতান্ত্রিক অর্থনৈতিক কাঠামো গড়ে না উঠলেও তার পরিচয় হয়— সমাজতান্ত্রিক। এছাড়াও বিরোধী দল পরিচালিত রাজ্য সরকারগুলিকে সংবিধানের ৩৫৬ ধারার ব্যাপক অপপ্রয়োগে অহরহ ফেলে দেওয়ার ঘটনা তো অসংখ্য বার ঘটেছে।

১৯৮৪ সালে ইন্দিরা গান্ধী নিজ দেহরক্ষী দ্বারা নিহত হন। এরপর গোটা দিল্লি জুড়ে প্রায় ৪,০০০ শিখকে হত্যা করা হয়। এই ভয়াবহ গণহত্যার পেছনে সক্রিয় ছিল কংগ্রেসের একাধিক নেতা, যাঁরা পরবর্তীকালে মন্ত্রীও হয়েছিলন। ১৯৯২ সালে শ্রীরামজন্মভূমি আন্দোলন চলাকালীন অযোধ্যায় বিতর্কিত ধাঁচা ভাঙা হলে ৩৫৬ ধারা জারি করে, হিমাচলপ্রদেশ, উত্তরপ্রদেশ, মধ্যপ্রদেশ ও রাজস্থানের বিজেপি শাসিত রাজ্য সরকারগুলিকে অসাংবিধানিকভাবে ফেলে দেওয়া হয়।

বিশ্বের বৃহত্তম গণতন্ত্র ভারতের একটি অন্যতম গণতান্ত্রিক বৈশিষ্ট্য হলো ৫ বছর অন্তর দেশের সাধারণ নির্বাচন এবং রাজ্যগুলির বিধানসভা নির্বাচন। এই নির্বাচনের দায়িত্বে থাকে ভারতীয় নির্বাচন কমিশন। ১৯৫২ সালে দেশে লোকসভা ও বিধানসভাগুলির নির্বাচন একসঙ্গে হয়। তখন ভারতের মুখ্য নির্বাচন কমিশনার ছিলেন সুকুমার সেন। ১৯৯০ সালে টিএন শেষণ মুখ্য নির্বাচন কমিশনার পদে স্থলাভিষিক্ত হয়ে নির্বাচনী বিধি সংস্কার করে ভোটারদের জন্য সচিত্র পরিচয়পত্রের ব্যবস্থা করতে উদ্যোগী হলে পশ্চিমবঙ্গে তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসু তাঁকে পাগল আখ্যা দেন! ৩৪ বছরের একটানা, জগদ্দল পাথরের মতো বাম-শাসনে পশ্চিমবঙ্গের রাজনৈতিক ক্ষেত্রটি হয়ে পড়ে বিষাক্ত। এই রাজ্যের অর্থনীতি ও যুবসমাজের কোমর ভেঙে দেওয়া হয়। বাম শাসনে পশ্চিমবঙ্গ জুড়ে চলে অসংখ্য গণহত্যা। সাঁইবাড়ি, মরিচঝাঁপি, আনন্দমার্গী, বানতলা, কান্দুয়া, নানুর, নন্দীগ্রাম, নেতাই হত্যাকাণ্ডের মতো ঘটনা এই দেশদ্রোহী বামপন্থীদের অমানবিক, নৃশংস কীর্তিকলাপের কিছু উদাহরণ মাত্র।

পশ্চিমবঙ্গ-বাংলাদেশ সীমান্ত বরাবর চলে অবাধ অনুপ্রবেশ। সীমান্ত জুড়ে কাঁটাতারের বেড়ার জন্য প্রয়োজনীয় জমি অধিগ্রহণে বার বার অসম্মতি জানায় বামফ্রন্ট পরিচালিত রাজ্য সরকার। পরিণামে বাংলাদেশি ও রোহিঙ্গা মুসলমানদের অবাধ অনুপ্রবেশে রাজ্যের একাধিক জেলার ডেমোগ্রাফি যায় পালটে। প্রতিটি ভোটে অবাধ রিগিং এবং তার সঙ্গে এই অবৈধ অনুপ্রবেশকারীদের ভোটে তাদের শাসন সুরক্ষিত করার রাজনৈতিক ব্যবস্থার বিরুদ্ধে ভারতীয় সংসদে একদা সোচ্চার হয়েছিলেন তৎকালীন বিরোধী নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। কিন্তু ২০১১ সালে পশ্চিমবঙ্গের শাসন ক্ষমতায় আসীন হয়ে তিনিও পূর্বতন বাম শাসকদের জুতোয় পা গলিয়ে সেই অনুপ্রবেশকারীদের ভোটেই নিজের শাসন সুরক্ষিত করার দিকে জোর দিয়েছেন। এই তথাকথিত সংখ্যালঘুরা আজ তার সুনিশ্চিত ভোটব্যাংক!

কাশ্মীরের ৩৭০ ধারা বাতিল, তিন তালাক বাতিল, পরোক্ষ কর ব্যবস্থার সংস্কার করে জিএসটি আইন প্রবর্তন, নতুন সংসদ ভবন নির্মাণ, শক্তিশালী সেনাবাহিনী গঠন, মহাকাশ-সহ অত্যাধুনিক বিজ্ঞান গবেষণার নানা ক্ষেত্রে প্রভূত উন্নতি; শিক্ষা ব্যবস্থার সংস্কারের লক্ষ্যে জাতীয় শিক্ষানীতি, ২০২০ প্রণয়ন-সহ সংসদে ভারতীয় ন্যায় সংহিতা— ভারতীয় দণ্ড সংহিতা প্রণয়ন এবং নাগরিকত্ব সংশোধনী আইন, ২০১৯-এ পাশ হলেও, এই নাগরিকত্ব আইনের বিধি জারি, দেশে অভিন্ন দেওয়ানি বিধি প্রণয়ন, এক দেশ-এক নির্বাচন, গোহত্যা বিরোধী আইন, ধর্মান্তরণরোধী আইন, জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ আইন পাশের মতো একাধিক সময়োপযোগী, সামাজিক-রাজনৈতিক সংস্কার এখনও বাকি। আইন ও বিচার ব্যবস্থার সংস্কারের ক্ষেত্রে ২০১৬ সালে ভারতীয় সংসদ দ্বারা প্রণীত 'ন্যাশনাল জুডিশিয়াল অ্যাপয়েন্টমেন্ট কমিশন' আইনটিকে বিচার ব্যবস্থার স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ বলে উল্লেখ করে ভারতের সুপ্রিম কোর্ট খারিজ করলেও গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার সাবালকত্ব অর্জনের ক্ষেত্রে বিচার ব্যবস্থার প্রভূত সংস্কারের প্রয়োজনীয়তার বিষয়টিকে উপেক্ষা করা যায় না। কৃষি ক্ষেত্রের সংস্কারের উদ্দেশ্যে কৃষি বিল আইনে পরিণত হলেও কৃষকের ছদ্মবেশে খালিস্তানি ও নৈরাজ্য সৃষ্টিকারী শক্তি বাম ও অতি বামপন্থীদের অরাজক আন্দোলনের কারণে কেন্দ্রীয় সরকার এই আইনগুলি প্রত্যাহার করে। দেশকে অশান্ত করে তোলার লক্ষ্যে মহারাষ্ট্রের ভীমা-কোরেগাঁও থেকে দিল্লির শাহিনবাগ— সর্বত্র সক্রিয় এই টুকরে টুকরে গ্যাং যাদের স্লোগান হলো কাশ্মীর মাঙ্গে আজাদি, মণিপুর মাঙ্গে আজাদি।

স্বাধীনতা লাভের এই অমৃতকালে স্মরণ করতে হবে দেশের স্বাধীনতা এনে দেওয়া সেই বীর বিপ্লবীদের, স্মরণ করতে হবে নেতাজী সুভাষচন্দ্র এবং তাঁর প্রবর্তিত প্রথম জাতীয় সরকারের অবদান, ভারতের মুক্তি সংগ্রামের লক্ষ্যে তাঁর সেনাবাহিনীর মরণপণ যুদ্ধ, মৈরাঙের মাটিতে প্রথম ভারতীয় পতাকা উত্তোলনের ইতিহাস, আন্দামান-নিকোবর দ্বীপপুঞ্জের শহিদ দ্বীপ ও স্বরাজ দ্বীপ নামকরণের ইতিহাস। সতর্ক থাকতে হবে গণতন্ত্রের আড়ালে ক্রিয়াশীল পরিবারতান্ত্রিক এবং বিদেশি অর্থে পুষ্ট এই নৈরাজ্যবাদী, বিচ্ছিন্নতাবাদী শক্তির যাবতীয় অপচেষ্টার বিরুদ্ধে। এক নতুন ও শক্তিশালী ভারত গঠনের লক্ষ্যে দেশপ্রেমিক জাতীয় সরকার নির্বাচিত হোক ভারতবাসীর লক্ষ্য। বিগত দিনের সমস্ত বিকৃতি মুছে ফেলে প্রকৃত সার্বভৌম ও পরিণত গণতান্ত্রিক দেশ হিসেবে বিশ্বের বুকে ভারতের স্বীকৃতিলাভ হোক ভারতীয় নাগরিকদের ধ্যেয়। ২৬ জানুয়ারি, ২০২৪ হোক সেই শপথ গ্রহণের পবিত্র দিন।

ভারতে ক্রুশের করাল গ্রাস একটি পর্যালোচনা

তন্বী শুকুল

সালটা ১৫১০। ভারতের একেবারে পশ্চিম উপকূলের একটি দ্বীপ রাজ্য। নাম গোপিকাপুরী। তখন রাজ্যে সুলতান আদিল শাহের শাসন। সময়টা মুঘল শাসনেরও আগে। এইসময় আগমন হলো পর্তুগিজদের। প্রথমে তারা দুটি দ্বীপের দখল নেয়। বারোদেশ যা এখন বারদেজ, আর সাষষ্ঠী যা এখন সালসেট নামে পরিচিত। আর বর্তমানে গোপিকাপুরী হলো আমাদের অতিপরিচিত গোয়া। হিন্দু অধ্যুষিত এই রাজ্যে শুরু হলো ভয়ংকর সন্ত্রাস। ইউরোপ থেকে দলে দলে এল ধর্মযাজকরা। চলতে থাকলো জোরপূর্বক ধর্ম পরিবর্তন। ১৫৪০ সালে এলেন সেন্ট ফ্রান্সিস জেভিয়ার, যার নামে বর্তমানে বিখ্যাত সব স্কুল, কলেজ। তিনি চিঠি লিখলেন তৎকালীন পর্তুগালের রাজাকে। অনুরোধ করলেন গোয়াতে কুখ্যাত ইনকুইজিশন আইন চালু করার জন্য। এরপর ১৫৬১ সালে মূলত জেভিয়ারের এই চিঠির উপর ভিত্তি করেই এল কড়া ইনকুইজিশন আইন। এই কুখ্যাত জেভিয়ারের হিন্দুদের প্রতি কেমন মনোভাব ছিল তা তার কথা থেকেই জানা যায়। জেভিয়ার বলেছিলেন, ‘‘হিন্দু একটি অতি অপবিত্র জাতি, তারা সব মিথ্যুক ও বিশ্বাসঘাতক। এসব তাদের মজ্জায় মিশে আছে। তাদের উপাস্যদের মূর্তিগুলি কালো কুচকুচে এবং দেখতে বিশ্রী ও ভয়ংকর, যার ওপরে আবার তেল ও অন্যান্য গন্ধদ্রব্যের প্রলেপের ফলে তা একেবারে নারকীয় ব্যাপার।’’

কিন্তু কী ছিল এই আইনে, একবার দেখে নেওয়া যাক। অবিশ্বাসী অর্থাৎ যারা খ্রিস্টান নয় এমন গ্রামে গিয়ে তাদের দিয়ে পাপ স্বীকার করানো অর্থাৎ খ্রিস্টমত গ্রহণ করানো। কোথাও কোনো নতুন মন্দির নির্মাণ অথবা কোনো পুরানো মন্দির সংস্কার করা যাবে না। কাঠ, পাথর অথবা মাটি কোনো কিছুর দ্বারাই হিন্দু দেবতাদের কোনো মূর্তি বানানো দণ্ডনীয় অপরাধ। ধরা পড়লে চরম শাস্তি পেতে হবে আর যে ধরিয়ে দেবে তার জন্য ছিল নগদ পুরস্কার। শুধু তাই নয়, কেউ জোর করে ধর্মান্তরিত হওয়ার পরে যদি পুনরায় পুরানো ধর্মাচরণ করে ধরা পড়লে তার জন্যও বরাদ্দ ছিল চরম শাস্তি। কেউ খ্রিস্টমত গ্রহণ না করলে অথবা চার্চের কাজে বাধা দিলে তাকে অথবা তার পুরো পরিবারকে নির্মমভাবে হত্যা করা হতো। বেশ কিছু ক্ষেত্রে জীবন্ত পুড়িয়ে মারার ঘটনাও ঘটেছে। এভাবে তারা সাধারণ মানুষের মনে ভয় ঢুকিয়ে দিত, আর এরজন্য প্রথম আঘাতটা করতো গ্রামপ্রধান অথবা পুরোহিতের ওপর। অবিশ্বাসীদের কারারুদ্ধ করা হতো। দিনের পর দিন সেখানে তাদের ওপর চালানো হতো অমানুষিক অত্যাচার। এই অত্যাচারের অন্যতম প্রমাণ্য দলিল হলো বিখ্যাত লেখক রিচার্ড জিমলরের লেখা অন্যতম বিখ্যাত বই ‘Guardian of The Dahn’। এই বইয়ে তিনি উল্লেখ করেছেন সেই সময়ে ঘটে যাওয়া ভয়ংকর সব ঘটনার কথা। তিনি লিখেছেন জেলে বন্দিরা অত্যাচার সত্ত্বেও ধর্ম পরিবর্তন করতে অস্বীকার করলে তাদের ‘Act of Faith’ নামক কুখ্যাত আইনের দোহাই দিয়ে জীবন্ত পুড়িয়ে, জনসমক্ষে ফাঁসি দিয়ে এবং আরও নানাভাবে হত্যা করা হতো। এইভাবে প্রায় ৪০০০ অখ্রিস্টানকে হত্যা করা হয়েছিল। অনেক সময় বাবা-মায়ের থেকে সন্তানকে কেড়ে নিয়ে, বাবা-মাকে বেঁধে রেখে তাদের চোখের সামনেই জীবন্ত পুড়িয়ে মারা হতো তাদের সন্তানদের। কোঙ্কনি, মরাঠি, সংস্কৃত অথবা আরবি ভাষার কোনো বই পড়া বা বিক্রি করা নিষিদ্ধ করা হয়। শুধু তাই নয়, কোঙ্কনি ভাষায় কথা বলা পর্যন্ত নিষিদ্ধ করে দেওয়া হয়।

এই আইন বলবৎ ছিল ১৫৬১ থেকে ১৮১২ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত অর্থাৎ প্রায় ২৫০ বছর ধরে। তারা ধ্বংস করেছিল অসংখ্য হিন্দু মন্দির। আর এইসব হিন্দু মন্দির ধ্বংসের তথ্য পর্তুগিজ দলিলেই আছে। কারণ প্রতিটি মন্দির ধ্বংসের পর তা চার্চ দ্বারা অধিগৃহীত হলে তার হিসেব তাদের লিখে পর্তুগালের রাজাকে জানাতে হতো। মন্দির ধ্বংসের হার কেমন ছিল তা এটা থেকেই বোঝা যায় যে ওই ক্ষুদ্র দ্বীপরাজ্যে এক বছরের মধ্যে ২৮০টি মন্দির ধ্বংস করা হয়েছিল। আর এই কাজ ইনকুইজিশন আইন চালু হওয়ার আগে থেকেই শুরু হয়েছিল। ১৬৬৯-এ সমস্ত হিন্দু অনাথদের চার্চ ধর্মান্তরিত করে দত্তক নেয়। এমনকী ধর্মান্তরিতদের বাড়িতে দেশীয় পোশাক ও ভাষা ব্যবহার নিষিদ্ধ হয়। হিন্দুরা নিজেদের প্রাণ বাঁচাতে অনেকেই ধর্মান্তরিত হতে বাধ্য হয়, আবার অনেকেই নদী পেরিয়ে পাশের আদিল শাহের রাজ্যে তাদের গ্রামের কুলদেবতার মূর্তি নিয়ে পালিয়ে যায়। কেউ যায় কেরালা, আবার কেউ উত্তরে। পুরোনো গোয়ার অধিকাংশ মন্দির ধ্বংস করা হয়েছিল। কিছু মন্দির যেগুলি পশ্চিমঘাট পর্বতের গভীর অরণ্যের মধ্যে ছিল তার মধ্যে কিছু মন্দির বেঁচে গেল। কিন্তু সময়ের সঙ্গে সঙ্গে আমরা সেগুলির অস্তিত্বও ভুলে গেলাম। তাই তো আজ গোয়া বেড়াতে গেলে আমরা লাইন দিয়ে ফ্রান্সিস জেভিয়ারের সমাধি দেখি আর বাদ দিয়ে দিই কদম্ব রাজাদের তৈরি তাম্বুরি সুরেলা শিব মন্দির। গোয়াতে ধর্মান্তরণ কী ব্যাপক আকারে হয়েছিল তা সামান্য একটা

BANSIDHAR BADRIDAS MODI PRIVATE LTD

EDEN HOUSE

17/1, LANSDOWNE TERRACE

LANSDOWNE MANOHAR PUKUR CROSSING

KOLKATA - 700026

OWNERS : SREE SIBBARI T.E

HEAD-OFFICE

P.O - DIBRUGARH, ASSAM

With best Compliments from :

তোমরা যদি ধর্ম ছাড়িয়া দিয়া পাশ্চাত্য জাতির জড়বাদ-সর্বস্ব সভ্যতার অভিমুখে ধাবিত হও, তোমরা তিনপুরুষ যাইতে না যাইতেই বিনষ্ট হইবে।

—স্বামী বিবেকানন্দ (৫/৪৬)

BHARAT STEEL INDUSTRIES

190, Girish Ghosh Road, Belurmoth, Howrah

Pin- 711 202

পরিসংখ্যান থেকে বুঝতে পারা যায়। সপ্তদশ শতকের শেষের দিকে গোয়ার জনসংখ্যা যখন ২লক্ষ ৫০ হাজার, তার মধ্যে কেবলমাত্র ২০ হাজার মানুষ ছিল খ্রিস্টান ব্যতীত অন্য ধর্মের। এক কথায় একে ethnic cleansing বলা চলে।

এসব ইতিহাসের পাতা উলটে এখন আর লাভ কী! কিন্তু ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি হয়। তা হয় নতুন করে অন্য রূপে। বর্তমানে শুধু গোয়া নয়, ভারতের অন্যান্য রাজ্য বিশেষ করে উত্তর-পূর্বাঞ্চল, ওড়িশা, ঝাড়খণ্ড ও পশ্চিমবঙ্গের বেশ কিছু অঞ্চলে এই ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি ঘটছে। অনেকে বলতেই পারেন , এখন তো জোরপূর্বক ধর্মান্তরণ হচ্ছে না। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে চার্চের কাজের ও প্রচারের ধরন কিছুটা পালটেছে। স্বাধীন ভারতে আগের আইন খাটবে না। তাই শুরু হয়েছে নতুন পদ্ধতি। কিছু ঘটনার উল্লেখ করলেই ব্যাপারটা পরিষ্কার হবে। পশ্চিমবঙ্গের জঙ্গলমহলের জেলাগুলির মধ্যে একটি ব্লক বাঁকুড়ার সারেঙ্গা। এখানেরই একটি জনজাতি প্রধান গ্রাম। মানুষজন সকালে মাঠে চাষের কাজে ব্যস্ত। হঠাৎ পাশের রাস্তা দিয়ে চলে যাওয়া একটি গাড়ি থামে। গাড়ি থেকে নেমে আসেন আধুনিক পোশাক পরা কিছু লোক। মাঠে কর্মরত গ্রামবাসীদের কাছে তারা বলেন যে তাদের গাড়ি খারাপ হয়ে গেছে। তারা যদি গাড়িটা একটু ঠেলে দেন। এরপরে শুরু হয় আসল ঘটনা। সহজসরল গ্রামবাসীরা তাদের কথামতো গাড়ি ঠেলতে রাজি হয় এবং ঠেলতে শুরু করে। কিন্তু গাড়ি স্টার্ট হয় না। তখন তারা বলেন যে গ্রামবাসীরা যেন তাদের ঈশ্বরের নাম নিয়ে গাড়িটি ঠেলে। কিন্তু গাড়ি তা সত্ত্বেও স্টার্ট হয় না। তখন তারা বলেন যে আপনারা যিশুর নাম নিয়ে গাড়িটা একবার ঠেলুন, আর এই ক্ষেত্রে গাড়ি স্টার্ট হয়ে যায়। এরপরই শুরু হয় আসল ঘটনা। গ্রামের মানুষদের বলা হয় তাদের দেবতাদের চেয়ে যিশু অনেক শক্তিশালী, তাদের দেওয়া পবিত্র জল খেলে সব রোগ সেরে যায় ইত্যাদি। ফলে সরল মানুষগুলি বার বার এই ধরনের কথা শুনে বিভ্রান্ত হয়ে এবং কিছুটা বাধ্য হয়েই ধর্মান্তরিত হয়।

আজ এই ঘটনা ঘটে চলেছে পশ্চিমবঙ্গের প্রায় প্রতিটি জেলাতেই শহরে, গ্রামে-গঞ্জে সর্বত্রই। এদের লক্ষ্য মূলত গ্রামের তফসিলি ও জনজাতি সম্প্রদায়ের মানুষ এবং শহরে বা শহরের উপকণ্ঠের বিভিন্ন বস্তি অঞ্চল। যেখানকার অল্প শিক্ষিত ও দরিদ্র মানুষগুলির অসহায়তার সুযোগ নিয়ে কোথাও রোগ সারানোর ছলনায়, আবার কোথাও আর্থিক সাহায্যের মাধ্যমে এরা নিঃশব্দে ধর্মান্তরণের কাজ চালিয়ে যাচ্ছে। বর্তমান আর্থ-সামাজিক অবস্থায় যখন বেকার যুবক-যুবতীর সংখ্যা অনেক, তাদের টাকার লোভ দেখিয়ে চার্চের এজেন্ট বানানো হচ্ছে।

এই এজেন্টরা তাদের টার্গেট অঞ্চলে গিয়ে সবচেয়ে আর্থিক ও মানসিকভাবে দুর্বল পরিবারকে নানাভাবে সাহায্য করছে। এরপর তাদের মাধ্যমে আশেপাশের মানুষদের বিশেষ করে বাড়ির মহিলাদের সঙ্গে যোগাযোগ করছে। বিভিন্ন ধরনের ওষুধ বা 'পবিত্র জল' নামে কোনো তরল পদার্থ পান করতে বলছে এবং এই সময় যিশুর নাম নিয়ে কাজটি করতে বলছে। এরপর ওই 'জল' খেয়ে সাময়িকভাবে কিছু উপকার হলে তাদের যিশুর প্রার্থনা করতে শেখানো হচ্ছে। বাড়িতে আর কোনো দেবতার পুজো বা উপাসনা করা যাবে না এই রকম আদেশ জারি করছে। মহিলাদের কপালে টিপ অথবা বিবাহিতদের মাথায় সিঁদুর পরার ওপরেও নিষেধ জারি করা হচ্ছে। ক্রমে ভগবানের ছবি বা মূর্তি বাড়ি থেকে ফেলে দিচ্ছে, আর এর পরে ধীরে ধীরে ওই অঞ্চলের এক বা একাধিক পরিবার ধর্মান্তরিত হচ্ছে।

দুটি ঘটনার মধ্যে সময়ের তফাত প্রায় সাড়ে চারশো বছরেরও কিছু বেশি। এর মধ্যে দেশের সামাজিক ব্যবস্থার অনেক পট পরিবর্তন হয়েছে। পরাধীন দেশ স্বাধীন হয়েছে। সংবিধান অনুসারে আমাদের দেশের আইন ব্যবস্থা গড়ে উঠেছে। কিন্তু এতদ্‌সত্ত্বেও সনাতন হিন্দুধর্ম আর সংস্কৃতির ওপর আঘাত কিছুমাত্র কমেনি। এটা সত্যি যে আজ আমাদের বহিঃশত্রুর চেয়ে অন্তঃশত্রুর বিপদ অনেক বেশি। আজ তথাকথিত লিবারেলরা এইসব চোখের সামনে ঘটতে দেখেও কোনোরকম প্রতিবাদ তো দূরের কথা বরং তাদের প্রশ্রয় দিচ্ছে। এইভাবে অবাধ ধর্মান্তরণ শুধুমাত্র আমাদের হিন্দু ধর্মই নয় , আমাদের ভারতীয় সমাজ, সংস্কৃতি ও সার্বভৌমত্বর জন্যও খুবই অশনি সংকেত।

এই ধরনের ঘটনার বিরুদ্ধে তথা ছলনার মাধ্যমে মানুষকে ভুল বুঝিয়ে বা অর্থের লোভ দেখিয়ে বেআইনি ভাবে ধর্ম প্রচারের বিরুদ্ধে ব্যাপক জনমত গড়ে তোলা আজ খুবই দরকার হয়ে পড়েছে। প্রয়োজন আজ সকলের সংগঠিত হওয়ার।

কিছুদিন আগেই উত্তর-পূর্ব ভারতের মণিপুর রাজ্য খবরের শিরোনামে এসেছিল। তার মূল কারণ ছিল দুই জনগোষ্ঠীর মধ্যে জমি আর ক্ষমতা দখলের লড়াই। মিডিয়া খুব সুচতুরভাবে মূল লড়াইয়ের কারণটিকে লুকিয়ে অপপ্রচার করে। এই লড়াই এখনো পর্যন্ত চলছে। এর পেছনের মূল কারণ হলো, মণিপুর রাজ্যে তিনটি জনগোষ্ঠী বাস করে—নাগা, কুকি আর মৈতেই। এদের মধ্যে নাগা আর কুকিরা পাহাড়ি অঞ্চলে বাস করে এবং এরা মূলত খ্রিস্টান আর মৈতেইরা থাকে উপত্যকা অঞ্চলে। মণিপুরের আইন অনুসারে এতদিন মৈতেইরা তফসিলি উপজাতির মধ্যে ছিল না। ফলে জমির ৭৮%-এর ওপরে তাদের অধিকার ছিল। বাকি দুটি সম্প্রদায়ের মধ্যে মৈতেইরা ছিল সংখ্যাগরিষ্ঠ। কিন্তু এই নতুন আইনের ফলে মৈতেইরা রাজ্যের সমস্ত জমির ওপরে অধিকার পায়। বিরোধের মূল কারণ হলো এটাই। উত্তর-পূর্ব ভারতের রাজ্যগুলি বারবার শিরোনামে এসেছে বিভিন্ন বিচ্ছিন্নতাবাদী গোষ্ঠীগুলির কার্যকলাপের জন্য। এখন যদি এই উত্তর-পূর্ব ভারতের জনবিন্যাস বিশেষ করে ধর্মীয় জানবিন্যাসের বিশ্লেষণ করা যায়, তাহলে দেখতে পাওয়া যাবে যে জনগণনা ২০১১ অনুসারে সারা ভারতের সর্বমোট খ্রিস্টান ২.৭৮ কোটি। যার মধ্যে শুধুমাত্র উত্তর-পূর্ব ভারতে এই সংখ্যাটা হলো ৭৮ লক্ষ। বর্তমানে নাগাল্যান্ড, মণিপুর, আর মিজোরামের অধিকাংশ মানুষ খ্রিস্টান।

উত্তর-পূর্ব ভারতের এই বিপুল সংখ্যক মানুষের খ্রিস্টান ধর্মাবলম্বী হওয়ার পেছনে ঠিক কী কী কারণ থাকতে পারে? এর উত্তর পেতে গেলে আবার আমাদের ইতিহাসের পাতা ওলটাতে হবে। চলে যেতে হবে ইংরেজ

শাসনের প্রথম দিকে। এই উত্তর-পূর্ব ভারতে ইংরেজদের প্রথম আগমন ঘটে প্রথম ইঙ্গ-বর্মা যুদ্ধকে কেন্দ্র করে ১৮২৪ খ্রিস্টাব্দে। এরও অনেক আগে থেকে ১৮১৩ সালে চার্টার আইন পাশ হওয়ার পর থেকেই মিশনারিরা এদেশে আসতে শুরু করে। উত্তর-পূর্ব ভারতের মধ্যে অসমে প্রথম আসে। অসমে এসে ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি সন্ধান পায় এক অমূল্য সম্পদের। অচিরেই তারা আবিষ্কার করে এখানে চা উৎপাদন ও রপ্তানির প্রভূত সম্ভাবনা আছে। কোম্পানি চা-বাগান তৈরি করে। এখানকার অধিবাসীদের জোর করে অথবা প্রলোভন দেখিয়ে চা-শ্রমিকে পরিণত করে। কিন্তু তাদের এই কাজে মূল বাধা হয়ে দাঁড়ায় নাগা সম্প্রদায়ভুক্ত মানুষেরা। স্বাধীনচেতা নাগারা কারুর নিয়ন্ত্রণে কাজ করতে অস্বীকার করে। শুধু তাই নয়, নাগারা বারবার আক্রমণ চালাতে থাকে এই চা-বাগানগুলিতে। বলাবাহুল্য, অসমে এই চা-বাগান স্থাপনের সঙ্গে সঙ্গেই খ্রিস্টান মিশনারিদের পদার্পণ ঘটে অসমে। মিশনারিরা আসে কোম্পানির সহযোগিতা করার জন্য। নাগারা হয়ে ওঠে কোম্পানির কার্য বিস্তারের মূল বাধাস্বরূপ। এখানে তাদের কীভাবে বশ্যতা স্বীকার করানো যায় তা নিয়ে চলে বিস্তর পরামর্শ ও আলোচনা। অবশেষে উঠে আসে একটি সহজ রাস্তা— ধর্মান্তরণ। কিন্তু উত্তর-পূর্ব ভারতের নাগা-সহ অন্যান্য জনজাতি মানুষদের নিজস্ব উন্নত যে সংস্কৃতি আছে সেখানে খ্রিস্টান মত প্রচার করা মিশনারিদের পক্ষে খুবই কঠিন। সেক্ষেত্রে তারা অন্য উপায় অবলম্বন করে। শিক্ষা বিস্তারকে তারা ধর্মপ্রচারের মাধ্যম হিসাবে বেছে নেয়। বলাবাহুল্য যে আজও দেশের বিভিন্ন প্রান্তে মিশনারিরা ধর্ম প্রচারের এই মাধ্যমটিকে অত্যন্ত সুচতুরভাবে ব্যবহার করে চলেছে সকলের সামনে। আমরা দেখে, বুঝে, শুনেও না দেখার ভান করে বসে আছি।

ব্রিটিশ আমলের একেবারে প্রথম থেকেই ধর্মপ্রচারের কাজ শুরু হয়। ১৭৯২ সালে কলকাতায় আসেন উইলিয়াম কেরি এবং জন থমাস। এরা দুজনেই ছিলেন নীলকর সাহেব। কিন্তু মিশনারির ছদ্মবেশে থেকে তারা ধর্ম প্রচারের কাজ শুরু করেন। স্থাপিত হয় শ্রীরামপুর চার্চ। এরপর আমের গারো পাহাড়ে ১৮১৩ সালে English Baptist Missionary Society একটি খ্রিস্টান স্কুল গড়ে তোলেন আর এখানে শিক্ষক তথা ধর্মপ্রচারক হিসাবে আসেন ধর্মান্তরিত এক বাঙ্গালি কৃষ্ণ পাল। কিছুদিনের মধ্যেই সুযোগসুবিধা, খাবার ও অর্থের লোভে কিছু মানুষ ধর্মান্তরিত হন। পরিকল্পনা করে ওইসব অঞ্চলে খাদ্যাভাবের সৃষ্টি করা হয় আর মানুষজনকে খাদ্যের লোভ দেখিয়ে ব্যাপক হারে ধর্মান্তরণ করা হয়। অসমীয়দের সহজে ধর্মান্তরিত করা গেলেও নাগাদের ক্ষেত্রে কাজটা এতটা সহজ হয়নি। প্রথমদিকে নাগা গ্রামগুলিতে স্কুল স্থাপন করলেও সেখানে পড়ার জন্য কোনো ছাত্র জোটেনি। এরপর আরেকজন ইংরেজ আধিকারিক ক্যাপ্টেন ফ্রান্সিস জেঙ্কিন্স, যিনি কোম্পানির রাজনৈতিক প্রতিনিধি ও কমিশনার ছিলেন তিনি ১৮৩৫ সালে আমেরিকার ব্যাপটিস্ট মিশনকে চিঠি লিখে এখানে ধর্মপ্রচার করার জন্য আহ্বান জানান।

American Baptist Mission (ABM) দ্রুত তাদের প্রশিক্ষিত বিশেষ করে নাগাভাষা জানা প্রতিনিধিদের সেখানে পাঠান। শুরু হয় বাইবেল অনুবাদের কাজ। নান-রা নাগাদের বাড়ি বাড়ি ঘুরে মহিলাদের মধ্যে বাইবেল ও যিশুর গল্পই শুধু শোনালেন না নাগাদের চিরাচরিত ধর্ম ও দেবতারা যিশুর তুলনায় কতখানি নগণ্য তাও প্রচার করলেন। ফলে মিশনারিদের স্কুলগুলিতে ধীরে ধীরে ছাত্র সংখ্যাও বাড়তে লাগল। প্রথম দিকে নাগা গ্রামের প্রধানরা এই স্কুলগুলিতে তাদের লোকেদের বিশেষ করে মেয়েদের একেবারেই পাঠানোর বিরুদ্ধে ছিলেন, ছেলেদেরও পাঠাতে চাইতেন না। কিন্তু ধীরে ধীরে পাদরিরা তাদের মধ্যে এমনভাবে যিশুর ও বাইবেলের গল্পের প্রচার করত আর তার সঙ্গে সঙ্গে নাগাদের চিরাচরিত প্রাচীন ধর্মের বিরুদ্ধে প্রচার করত যে খুব তাড়াতাড়িই মিশনারিদের স্কুলগুলিতে ছাত্রসংখ্যা বাড়তে শুরু করল। সেই স্কুলগুলিতে মূলত বাইবেল ও খ্রিস্টসংক্রান্ত শিক্ষাই বেশি করে দেওয়া হতো। এর প্রভাবস্বরূপ, সহজসরল নাগারা ধর্মান্তরিত হতে শুরু করে। একদিকে যেমন ছিল অর্থ ও জীবিকার সুবিধা আর অন্যদিকে ইংরেজ শাসকদের তৈরি করা খাদ্যাভাব। এইগুলিই পাদ্রিদের মূল হাতিয়ার হয়ে ওঠে। পরবর্তীকালে এমন ঘটনা ঘটেছে যে ধর্মান্তরিত নাগারা খ্রিস্টমতের প্রভাবে এসে তাদের চিরাচরিত ধর্মীয় রীতিনীতি ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যকে অস্বীকার ও অবহেলা করা শুরু করে, আর এ নিয়ে অচিরেই মূল নাগাদের সঙ্গে তাদের বিরোধ বেঁধে যায়। অনেক সময় এই নব্য ধর্মান্তরিত নাগারা গ্রাম থেকে বিতাড়িত হয়ে নতুন করে বসতি স্থাপন করলে ব্রিটিশশাসক ওই নতুন বসতিগুলিতে অধিক সুযোগসুবিধা প্রদান করত। ফলে সুকৌশলে মিশনারি ও ব্রিটিশ শাসকের মিলিত প্রচেষ্টায় অবাধ ধর্মান্তরণ শুরু হয়েছিল। এই ধর্মান্তরণের বিষয়টিতে সবচেয়ে মজার ব্যাপার হলো খ্রিস্টান মিশনারিরা অনেক অর্থ ব্যয় করে বিদেশ থেকে পাদরিদের আনলেও তারা অচিরেই উপলব্ধি করে যে এদেশীয় জনজাতিরা বিদেশি নয়, এদেশীয় ধর্মান্তরিত খ্রিস্টান দ্বারা বেশি প্রভাবিত হতো। তাই প্রথমে তৎকালীন বঙ্গপ্রদেশ থেকে প্রথমে অসমে ও পরে ধর্মান্তরিত অসমীয় নাগাজাতির আও সম্প্রদায়কে প্রথমে ও পরে আঙ্গামী নাগাদের মধ্যে খ্রিস্টমত প্রচার করে। নাগাদের সম্পূর্ণভাবে ধর্মান্তরিত করতে এদের মাত্র এক শতাব্দী সময় লাগে। বিলুপ্ত হয়ে যায় সভ্যতার আদি থেকে গড়ে ওঠা নাগা সভ্যতার বৈচিত্র্যপূর্ণ সংস্কৃতি। ফলে যে যোদ্ধাজাতি রোজ সন্ধ্যায় সমবেত হয়ে আগুনের চারপাশে বসে যুদ্ধ ও শিকারের লোকগাথা মাথা উঁচু করে গাইত, তারা আজ গির্জায় পাদ্রির সামনে মাথা নীচু করে গাইছে—Praise The Lord.

উত্তর-পূর্ব ভারতের রাজ্যগুলিতে খ্রিস্টমতের প্রচার কিন্তু সবচেয়ে বেশি হয়েছে ১৯৩১ থেকে ১৯৫১ সালের মধ্যে। স্বাধীনোত্তর কালে চার্চগুলি বিচ্ছিন্নতাবাদী বিভিন্ন গোষ্ঠীগুলির প্রধান মদতদাতা ও কেন্দ্র হয়ে ওঠে। আঞ্চলিক জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের জনক হয়ে ওঠে। আর এইসব বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলনের আড়ালে ১৯৫১ সালের পরবর্তী সময়ে খ্রিস্টমতের প্রচার-প্রসার উত্তর-পূর্বাঞ্চলে অত্যন্ত বৃদ্ধি

পায়। এবার দেখে নেওয়া যাক রাজ্য অনুসারে ধর্মান্তরণের তথ্যগুলি—

মেঘালয় : জনগণনা ২০১১ অনুসারে ৭৫% জনসংখ্যা এখানে খ্রিস্টান। মিশনারিরা শিক্ষাকে হাতিয়ার করেই এরাজ্যে ধর্মপ্রচার করে।

মিজোরাম : জনগণনা ২০১১ অনুসারে ৯০ শতাংশের বেশি এখানে খ্রিস্টান। মেঘালয়ের পরে এখানে ধর্মান্তরণের কাজ শুরু হয়, এতই ব্যাপক হারে হয় যে ১৯১১ সালে ৩% আর এখন ৯০% -এরও বেশি।

মণিপুর : এরাজ্যে মিশনারিদের পদার্পণ ঘটে স্বাধীনতার পরবর্তী সময়ে। রাজ্যের পাহাড়ি অঞ্চলের প্রায় সব জনজাতি মানুষই ধর্মান্তরিত। তা সত্ত্বেও সমতলে বসবাসকারী মৈতেই হিন্দুদের বিপুল জনসংখ্যার জন্য এখানে খ্রিস্টানের সংখ্যা অপেক্ষাকৃত কম। কিন্তু জনগণার তথ্য এ রাজ্যে ধর্মান্তরণের হার বোঝাতে সাহায্য করবে

১৯৩১ সালে ছিল ২%
১৯৫১ সালে হয় ১২%
২০১১ সালে হয় ৪১%

নাগাল্যান্ড ঃ এরাজ্যেও স্বাধীনতার পরেই ধর্মান্তরণের ঘটনা বেশি ঘটেছে নীচের তালিকাগুলি আমরা একটু দেখে নেবো।

জনগণনার সাল	খ্রিস্টান জনসংখ্যা
১৯১১	২%
১৯৩১	১৩%
১৯৫১	৪৬%
১৯৯১	৮৭%
২০১১	৯৮%

অরুণাচল প্রদেশ : ১৯৭১ সালের আগে এখানে মিশনারিদের পা পড়েনি। কিন্তু এর পরবর্তী সময়ে এমন ব্যাপক হারে ধর্মান্তরণ হয়েছে যে আজ ওই রাজ্যের ৩০% জনজাতি মানুষ খ্রিস্টান। শুধু তাই নয়, অনেক জনজাতিদের মধ্যে আজ খ্রিস্টানরা সংখ্যাগরিষ্ঠ।

অসম : চা-বাগান ও ব্যবসাকে কেন্দ্র করেই এখানে ধর্মান্তরণ শুরু হয়। মূলত চা-বাগানে কর্মরত ছিন্নমূল জনজাতি শ্রমিকরা প্রথম ধর্মান্তরণের কবলে পড়ে। জনজাতি অধ্যুষিত জেলাগুলি যেমন অন্যাংলং, দিমা, হোস, বরো এগুলোতে আজ খ্রিস্টান জনসংখ্যা বেশি। অসমে ১৯০১ সালে যেখানে মাত্র ০.৪% খ্রিস্টান ছিল তা আজ প্রায় ৮৫% বৃদ্ধি পেয়ে ২০১১ সালে ৩.৭৫% পৌঁছেছে।

অধিকাংশ ক্ষেত্রেই রাজনৈতিক, প্রশাসনিক ব্যবস্থার সাহায্যে অত্যন্ত সুকৌশলে ধর্মান্তরণের কাজ চলেছে। সারা দেশে কোথাও শিক্ষার আড়ালে, আবার কোথাও স্বাস্থ্য পরিষেবার আড়ালে চলছে ধর্মপ্রচারের কাজ।

ত্রিপুরা : এখানে ধর্মান্তরণের ঘটনা ১৯৮১ সালের পর ব্যাপক বৃদ্ধি পেয়েছে। ১৯৫১ সালে খ্রিস্টান জনসংখ্যা ছিল মাত্র ৫০০০, তা ২০১১ সালে বৃদ্ধি পেয়ে হয়েছে ১.৬ লক্ষ।

সিকিম : এ রাজ্যেও খ্রিস্টান ধর্মান্তরণের ঘটনা বেশি বৃদ্ধি পেয়েছে ১৯৭১ সালের পরে। ১৯৭১ সালে এই হার ছিল যেখানে মাত্র ০.৮% তা বর্তমানে বৃদ্ধি পেয়ে হয়েছে ১০%, অর্থাৎ প্রায় ১০০ গুণের চেয়ে বেশি বৃদ্ধি হয়েছে।

উত্তরপূর্ব ভারতের রাজ্যগুলিতে খ্রিস্টান ধর্ম প্রচারের সময় ও ইতিহাসের বিশ্লেষণ করলে আমরা দেখতে পাবো অধিকাংশ ক্ষেত্রেই রাজনৈতিক, প্রশাসনিক ব্যবস্থার সাহায্যে অত্যন্ত সুকৌশলে এই ধর্মান্তরণের কাজ চলেছে এবং আজও চলছে। সারা দেশে কোথাও শিক্ষার আড়ালে, আবার কোথাও স্বাস্থ্য পরিষেবার আড়ালে চলছে ধর্মপ্রচারের কাজ।

এখন আমাদের মনে প্রশ্ন উঠতেই পারে যে বর্তমানে স্বাধীন ভারতবর্ষে এই ধর্মান্তরণের কাজ চালানোর জন্য মিশনারিরা এত অর্থ পায় কোথা থেকে? এর উত্তর হলো এতদিন বিদেশের বিভিন্ন চার্চ সংগঠনগুলি সেবার কাজের নাম করে বিভিন্ন এনজিও-তে তাদের টাকা পাঠাতো। ওই টাকায় সামান্য কিছু উন্নয়নমূলক কাজ হলেও মূলত কিছু সংস্থা তার বেশিরভাগ ধর্মপ্রচারের কাজে ব্যয় করতো।

বর্তমানে ২০২০ সালের পরে কেন্দ্রীয় সরকার FCRA [Foreign Contribution Regulation (Amendment) Act, 2020] আইন পাশ করায় এই সমস্ত সেবার নামে ধর্মপ্রচারকারী সংস্থাগুলির পকেটে টানা পড়েছে। ঠিকমতো বৈদেশিক মুদ্রার ফান্ডের খরচের হিসেব না দিতে পারায় অনেকের অনুমোদন বাতিল হয়ে গেছে। কেয়ার ইন্ডিয়া বা অক্সফামের মতো বড়ো সংস্থাও আজ প্রায় বন্ধ হয়ে গেছে। অর্থাৎ ধর্ম প্রচারের জন্য বিদেশি ফান্ড এখন প্রায় বন্ধ। কিন্তু তাহলে এরা এতো টাকা পাচ্ছে কোথা থেকে? এর জন্য আমাদের একটু চোখ-কান খোলা রাখতে হবে, তাহলে উত্তর আমরা নিজেরাই খুঁজে নিতে পারবো।

আমাদের আশেপাশে একটু খেয়াল করলেই দেখতে পাবো যে আজ মিশনারি স্কুলের ছড়াছড়ি। আজ সমাজের মধ্যবিত্ত থেকে উচ্চবিত্ত সকলেই তাদের সন্তানকে ইংরেজি শিক্ষিত করতে চাইছে। আর তার জন্য তারা নির্ভর করছে মিশনারি স্কুলগুলির ওপর। আর এইসব স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীদের অভিভাবকদের থেকে যে মোটা অঙ্কের অর্থ স্কুলগুলি পায় তারই একটা বড়ো অংশ চলে যায় চার্চের কাছে যা ধর্মান্তরণের কাজে ব্যবহৃত হয়। অনুরূপ ঘটনা মিশনারি হাসপাতালগুলোর ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। এসব ঘটনাকে যারা খুবই হালকা ভাবে নিচ্ছে তাদের গোয়া-সহ উত্তরপূর্ব ভারতের রাজ্যগুলির Demography র পরিবর্তনের ইতিহাসটা জানা খুব দরকার। ধর্মান্তরণ যত বাড়বে বিভিন্ন বিচ্ছিন্নতাবাদী শক্তিগুলো ততই মাথা তুলে জেগে উঠবে। ভারতীয় সংস্কৃতির ওপরে এই বহিরাগত বৈদেশিক আক্রমণকে সংগঠিতভাবে আমাদের প্রতিহত করতেই হবে। □

With Best Compliments
from -

SRESTH PRODUCTS PVT. LTD.

Dealing in all kind of edible oil

49, Strand Road,
Kolkata - 700 007

With Best Compliments From -

South Calcutta Diesels Pvt. Ltd.

Sales & Service

225-D, A. J. C. Bose Road, Kolkata - 700 020

Phone : 2302-5250/ 3/ 4, Fax : 033-2281-2509 / 2287-6329,

E-mail : scdtodi@scdtodi.com

Authorised Dealers of

- **BOSCH LTD.**
- **BOSCH, GMBH-GERMANY,**
- **DEUTZ, A. G., GERMANY**
- **LOMBARDINI - ITALY,**
- **V. M. MOTORI - ITALY**

অটলবিহারী

স্বস্তিকা পত্রিকায় ২৫ ডিসেম্বর ২০২৩ তারিখে প্রচ্ছদ নিবন্ধ 'বহুমুখী প্রতিভায় অবিস্মরণীয় অটলবিহারী বাজপেয়ী' পড়ে মুগ্ধ হলাম। লেখক শেখর সেনগুপ্তের লেখা 'অটলবিহারীর অবদান চিরন্তন ও অটল' পড়ে খুব ভালো লাগল। লেখক অটলবিহারীর সম্বন্ধে যথাযথ কথাই লিখেছেন। অটলবিহারীর নামের সঙ্গে তাঁর অটল অবদান তা যুগের সঙ্গে চিরন্তন সত্য। লেখক শেখর সেনগুপ্ত এক জায়গায় বলছেন যে, অটলবিহারী একমেবদ্বিতীয়ম। অতোবড়ো হৃদয়বান নেতা যুগ যুগ ধরে খুঁজে বেড়ালেও আর পাওয়া যাবে না। এঁনারা হন ক্ষণজন্মা মহাপুরুষ।

ভারতবর্ষের মতো দেশে অটলবিহারীর মতো এত সুন্দর একজন প্রধানমন্ত্রী পাওয়া এক দুর্লভ ব্যাপার। তাঁর চরিত্রের সবচেয়ে বড়ো গুণ তাঁর সততা, সংযমিত জীবন, শান্ত প্রকৃতি। তাঁর সংযম, শালীনতা ও উদারতা দেশ ও বিদেশের জনগণকে মুগ্ধ করতো। তিনি ছিলেন কবি, সাহিত্যিক এবং সাহিত্যপ্রেমিক একজন মানুষ। অটলবিহারীর জীবন অতি মূল্যবান ও শিক্ষণীয়। তিনি ছিলেন ভারতবর্ষের প্রথম স্বয়ংসেবক প্রধানমন্ত্রী। অটলবিহারীর মৃত্যু শুধুমাত্র ভারতবর্ষের মতো দেশের এক বিরাট শূন্যতা তা নয়, আন্তর্জাতিক মহলেরও বিরাট এক ক্ষতি।

—**সঞ্জয় ব্যানার্জী,**
চুঁচুড়া, ব্যারাক রোড, হুগলী।

শ্রীরাম আবেগে ভাসছে পশ্চিমবঙ্গ

এই পত্র লেখার সময় শ্রীরাম মন্দিরের শুভ উদ্বোধনের আর কয়েকদিন বাকি। কংগ্রেস, কমিউনিস্ট তথা সেকুলার ও প্রগতিশীল তথাকথিত বুদ্ধিজীবীদের শ্রীরাম বিরোধিতা সত্ত্বেও সারা দেশের সঙ্গে শ্রীরাম আবেগে ভাসছে আমাদের রাজ্য পশ্চিমবঙ্গও। শ্রীরামমন্দির উদ্বোধনের নিমন্ত্রণ চলছে দেশের প্রতিটি পরিবারে। রামভক্তরা দলে দলে বেরিয়ে বাড়ি বাড়ি নিমন্ত্রণপত্রের সঙ্গে অযোধ্যায় পূজিত চাল দিচ্ছেন। নিমন্ত্রণকারীরা দরজায় পৌঁছানো মাত্র বাড়ির লোকেরা উপস্থিত হয়ে ভক্তিভরে নিমন্ত্রণ গ্রহণ করছেন। কেউ কেউ আবেগে জয় শ্রীরাম ধ্বনি দিচ্ছেন। কেউ কেউ শঙ্খধ্বনি করে বরণ করছেন। সেদিন পাঁচটি প্রদীপ জ্বালানোর কথা শুনে কেউ কেউ বলছেন, পাঁচটি নয়, একশোটি জ্বালাবেন। এই পরিবেশ দেখে মনে হচ্ছে, রামভক্তির এই স্রোতে শ্রীরামবিরোধীরা কোথায় যেন ভেসে গিয়েছেন।

—**স্নেহময় পাত্র,**
স্কুলডাঙ্গা, বাঁকুড়া।

শ্রীরাম ও বাঙ্গালি

স্বস্তিকা পত্রিকার গত ৮ জানুয়ারি সংখ্যায় ড. অচিন্ত্য বিশ্বাসের 'শ্রীরাম ও বঙ্গ-সংস্কৃতি' প্রচ্ছদ নিবন্ধটি ইতিহাসের একটি দলিল হিসেবে চিহ্নিত হয়ে থাকবে। বঙ্গসংস্কৃতির সঙ্গে শ্রীরাম যে অঙ্গাঙ্গীভাবে যুক্ত তার প্রমাণ হিসেবে ড. শ্রীবিশ্বাস এই খণ্ডিত বঙ্গের ৩৬টি বহু প্রাচীন রামমন্দিরের উল্লেখ করেছেন, যেগুলির গাত্রে মন্দির প্রতিষ্ঠার সাল ও তারিখ লিপিবদ্ধ করা রয়েছে। বাঙ্গালি জাতিকে কংগ্রেস, কমিউনিস্টরা বহু বছর ধর্মবিমুখ করার চেষ্টা করেছে। কিন্তু কোনো লাভ তারা করতে পারেনি। বর্তমানে তৃণমূল দল এই ঘৃণ্য খেলায় মেতেছে। তারাও কিছু করতে পারবে না। ওই সংখ্যায় সম্পাদকীয়তে অতি সত্যিকথা বলা হয়েছে, ধর্মের জয় হবেই, যারা বিরোধিতা করবে তারা নিজেরাই ধ্বংস হয়ে যাবে।

—**অনিরুদ্ধ চক্রবর্তী,**
গড়িয়া, কলকাতা-৮৪।

অযোধ্যায় রামমন্দির উদ্বোধন

ভারতের ইতিহাসে শাশ্বত সুন্দরের জয় প্রতিষ্ঠা পেল। ভারতবর্ষ পবিত্র ধর্মভূমি ও অধ্যাত্মভূমি। শত সহস্র বছর ধরে বহু ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্যে দিয়েও সেই সনাতন ধারা প্রবাহিত। বহু বৈদেশিক আক্রমণে ক্ষতবিক্ষত হয়েও সেই সাংস্কৃতিক ধারাকে স্তব্ধ করতে পারেনি। তার অগ্রগতি অক্ষুণ্ণ থেকে বয়ে নিয়ে চলেছে-মহর্ষিদের চিন্তাধারা। ভারতীয় দার্শনিকদের মতবাদ সারা বিশ্বে সমাদৃত। জীব ও জগৎ অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। প্রশ্ন জাগে, ধর্মের প্রকৃত অর্থ কী? যা ধারণ করে মনুষত্বের বিকাশ ঘটায় তাই ধর্ম। ধর্মের বিভিন্নতা থাকলেও লক্ষ্য কিন্তু এক। এই জীব ও জগৎকে প্রেম ও ভালোবাসা দিয়ে রক্ষা করাও ধর্মের অঙ্গ। এটাই সনাতনী দর্শন। ভারতবর্ষে প্রথম বৈদেশিক আক্রমণ ঘটে খ্রিস্টপূর্ব ৩২৬ অব্দে গ্রিকদের। তখন খ্রিস্টানদের উৎপত্তি হয়নি। ইসলাম তো নয়ই। খ্রিস্টান ও ইসলাম কোনো ধর্ম নয়, রিলিজিয়ন। সেগুলি কেউ না কেউ সৃষ্টি করেছে। কিন্তু সনাতন ধর্মের কোনো স্রষ্টা নেই।

ভারতের ইতিহাসের পাতা খুঁজলে দেখবো একাদশ শতাব্দীতে বিক্রমাদিত্য কর্তৃক শ্রীরামজন্মভূমি অন্বেষণ এবং মন্দির নির্মাণ হয়। বাবরের আক্রমণের সময়ে মন্দির ভেঙে মসজিদ তৈরির চেষ্টা হয়। রাণা সংগ্রাম সিংহের সঙ্গে যুদ্ধে বাবর আহত হয়। পরে যুদ্ধে রাণা সংগ্রাম সিংহ পরাজিত হন এবং মন্দির ভাঙার কাজে মীর বাকি খাঁকে নিযুক্ত করা হয়। তোপের সাহায্যে মন্দির ভাঙা হয়। মহাত্মা শ্যামানন্দকে অযোধ্যা থেকে তাড়িয়ে দেওয়া হয়। সে সময় রাজা মহতাব সিংহ ১ লক্ষ ৭৪ হাজার সৈনিক -সহ আক্রমণ করেন। ৪ লক্ষ ৫ হাজার মুঘল সৈন্যের বিরুদ্ধে। যুদ্ধে তিনি মৃত্যু বরণ করেন। জলের বদলে সৈন্যদের রক্ত দিয়ে মসজিদ নির্মাণ হয়। এরপর দেবীদীন পাণ্ডে ৯০ হাজার ক্ষত্রিয় বংশীয় সৈন্য নিয়ে আক্রমণ করেন এবং ৫ দিন যুদ্ধ করে নিহত হন। হংসবরের রাজা রণবিজয় সিংহ ২৫০০০ হাজার সৈন্য নিয়ে আক্রমণ করেন, ১০ দিন যুদ্ধের পর তার মৃত্যু হয়। রণবিজয়ের পত্নী জয়রাজ কুমারী মহিলাদের

ফঃ ৩

WITH BEST COMPLIMENTS FROM :-

ASHOKA TOOLS PVT. LTD.

MECHANICAL & STRUCTURAL ENGINEERS

email : ashokatools@hotmail.com

-: REGD. OFFICE :-

23A, Netaji Subhas Road,

11 th Floor, Room No. 31,

Kolkata-700 001

Phone No. 9331229004

-: FACTORY :-

Santra para, Par Dankuni

Hooghly, Pin- 712310

PHONE : OFFICE : 2231-9166/

PH. 9903853534

With the best Compliments from :

JALAN CHEMICAL & INDUSTRIES PVT. LTD.

Director : Rajesh Jain

27AB Royd Street, Ground Floor

Kolkata-700016

Phone : 22297263 (O) 40017926

একত্রিত করে গেরিলা যুদ্ধ শুরু করেন। জয়রাজের মহেশ্বরানন্দজী সন্ন্যাসী রামভক্তদের নিয়ে যুদ্ধে শামিল হন। মহেশ্বরানন্দজীর মৃত্যুর পর স্বামী বলরামচারী বার বার সৈন্য সংগ্রহ ও আক্রমণ চালিয়ে যান। তাঁর বীরত্বে মুগ্ধ হয়ে আকবর টোডরমল ও বীরবলের পরামর্শে রামমন্দির নির্মাণের অনুমতি দেন।

পরবর্তী ইতিহাস ঔরঙ্গজেব কর্তৃক পুরাক্রমণ এবং প্রয়াগের অহল্যা ঘাটের পরশুরাম মঠের মহন্ত ও স্বামী রামানন্দ দাসের নেতৃত্বে ৩০ বার যুদ্ধ হয়। এভাবে বহু যুদ্ধ চলতে থাকে। ১৮৫৩ সাল থেকে পুনরায় সংগ্রাম শুরু হয়। ১৮৫৫ সাল মুসলমানদের দ্বারা হনুমানগঢ়ী আক্রমণ হয় এবং হিন্দুদের সমন্বিত আক্রমণে প্রতিহত হয়। তারপর ১৮৫৭ সালে ইংরেজদের বিরুদ্ধে মহাসংগ্রামে হিন্দুদের সঙ্গে মুসলমানরা আপোশ করে। ফলে হিন্দু-মুসলমান ঐক্য স্থাপিত হয়। এই মহাসংগ্রামের গতি প্রকৃতি অনুধাবন করে ব্রিটিশরা ডিভাইড অ্যান্ড রুল গ্রহণ করে।

ভারতকে খণ্ডিত করে ব্রিটিশদের লক্ষ্য সার্থক হলো। স্বাধীনতা পরবর্তী কংগ্রেসের মুসলমান তোষণের ফলশ্রুতির ফলে মন্দির পুনরুদ্ধার হলো না। অবশেষে বর্তমান মোদী সরকারের আমলে কাশ্মীরে ৩৭০ ধারা রদ, রাম মন্দির উদ্বোধন এ এক নতুন ভারতের সার্থক রূপায়ণ। এর ফলে শুধু ভারত নয় সারা বিশ্ব আজ মোদীময়। শাশ্বত-সুন্দর সনাতন ধর্মাবলম্বীদের জয় প্রতিষ্ঠা পেল।

—**রবীন্দ্রনাথ রায়,**
সাহেবের হাট, রাশিডাঙ্গা-২,
কোচবিহার।

কেন্দ্র সরকারের সঠিক পদক্ষেপ

উত্তরপ্রদেশের আলিগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয়ে 'সংখ্যালঘু শিক্ষা প্রতিষ্ঠান'-এর তকমার বিরুদ্ধে আইনি পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে বর্তমান কেন্দ্রীয় সরকার। অনেক দেরি হলেও এটা যে একেবারে সঠিক পদক্ষেপ তা বলাই বাহুল্য। ইতিহাস সচেতন মানুষ জানেন, ভারত ভাগ করে পাকিস্তান সৃষ্টির পেছনে এই বিশ্ববিদ্যালয়ের জঘণ্য ভূমিকা রয়েছে। পাকিস্তান সৃষ্টির পরও এই প্রতিষ্ঠানের ছাত্র ও অধ্যাপকরা দেশবিরোধী কাজের সঙ্গে যুক্ত রয়েছে। আর এদের দেশবিরোধী কাজের মদতদাতা হিসেবে কংগ্রেস ও কমিউনিস্টরা কাজ করছে। এই বিশ্ববিদ্যালয়ের বহু ছাত্র ও শিক্ষকের দেশবিরোধী কাজের প্রমাণও রয়েছে। প্রতিষ্ঠার সময় এই প্রতিষ্ঠান শুধুমাত্র মুসলমানদের জন্য ছিল না। ১৯৮১ সালে তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী মুসলমান তোষণের জন্য মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয় ঘোষণা করেন। কংগ্রেসের কৃত পাপ স্খলনের জন্য বর্তমান কেন্দ্রীয় সরকার ওই প্রতিষ্ঠানকে 'জাতীয় গুরুত্বসম্পন্ন প্রতিষ্ঠান' ঘোষণা করে সঠিক পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে, এতে কোনো সন্দেহ নেই। কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে আবেদন যে, দেশবিরোধী সমস্ত প্রতিষ্ঠান এভাবে জাতীয় স্রোতে ফেরাতে হবে কিংবা তাদের অনুমোদন বাতিল করতে হবে।

—**সুজন সমাদ্দার,**
গোরাবাজার, বহরমপুর, মুর্শিদাবাদ।

পশ্চিমবঙ্গের সীমাহীন দুর্নীতির কোথায় শেষ?

বড়ো আক্ষেপ থেকে উদ্গত এ বাণী আজ আমার কলম থেকে পত্র আকারে নির্গত হচ্ছে। আমাদের রাজ্য পশ্চিমবঙ্গের অবস্থা বর্তমানে শোচনীয় হয়ে উঠেছে। সরকারের যে কোনও বিভাগে দুর্নীতি যেন আজ একটি স্বাভাবিক ঘটনা। কখনও কোনো বিষয়ে সামান্যতম তদন্ত হলেই দেখা যায় হিমালয় সদৃশ দুর্নীতি। তার পরেই জানা যায় এ হলো হিমালয়ের চূড়া মাত্র। হিমালয়সদৃশ দুর্নীতি, যদি হিমালয়ের চূড়া হয় তাহলে হিমালয়ের অদেখা অংশ অর্থাৎ সামগ্রিক দুর্নীতি যে কতটা ব্যাপক তা ভাবলেও মন আতঙ্কিত হয়। অথচ এক সময় আমাদের এই পশ্চিমবঙ্গ ছিল দুর্নীতিমুক্ত। স্বাধীনতার পর প্রথম দু'দশক আমাদের রাজ্য প্রত্যক্ষ করেছিল সৎ, উচ্চশিক্ষিত, দুর্নীতিমুক্ত, আদর্শবাদী নেতাদের, আর আজ পশ্চিমবঙ্গ প্রত্যক্ষ করছে সম্পূর্ণ অসৎ, অশিক্ষিত, দুর্নীতির পঙ্কে আকণ্ঠ নিমজ্জিত, মস্তান পরিবৃত নেতাদের।

এই পতনের সূত্রপাত হয়েছিল বামপন্থীদের হাত ধরে। তারা এবং তাদের পদাঙ্ক অনুসরণকারী বর্তমান সরকারের আমলে পশ্চিমবঙ্গ হয়ে উঠেছে আজ দুর্নীতির পীঠস্থান। ১৯৬৭ থেকে ২০২৪ গত সাড়ে পাঁচ দশকের এই নিম্নাভিমুখী যাত্রাপথের শেষে আমরা উপনীত হয়েছি এমন এক নরকসদৃশ অবস্থায় যেখানে দুর্নীতি লোকের কাছে স্বাভাবিক ঘটনা। কোটি টাকার দুর্নীতি এমন আর আলোচ্য বিষয়ের মধ্যে ঠাঁই পায় না। কারণ দুর্নীতি শুরুই হয় দশ হাজার কোটির থেকে। মুখ্যমন্ত্রী নির্বিবাদে বলেন এ তো ছোটোখাটো ব্যাপার। সাধারণ মানুষ কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে নীরবে সহ্য করে। কোনও জনরোষ আছড়ে পড়ে না। একদিকে নেতাদের বাড়ি থেকে টাকার পাহাড় উদ্ধার হয়, অন্যদিকে সাধারণ ঘরের মেধাবী ছাত্রীরা বছরের পর বছর অনাহারে দিন কাটায়। কারণ চাকরি নেই, সেখানেও দুর্নীতি! অথচ আমাদের দেশের অন্য রাজ্যগুলির অনেকেই দুর্নীতিমুক্ত হওয়ার পথে অনেক এগিয়ে। উত্তরপ্রদেশে যখন পুলিশের গুলিতে একের পর এক মাফিয়ার প্রাণ যায় আমাদের রাজ্যে তখন পুলিশ শাজাহানের মতো মাফিয়াদের পরোক্ষে রক্ষা করে। এই রাজ্যেও চাই যোগীরাজ। তাহলেই ন্যায়দণ্ডের যথাযথ প্রহারে এ রাজ্যের কুশাসকদের যথোচিত শাস্তি দিয়ে এ রাজ্যবাসীকে এই দুর্নীতি অসুরের হাত থেকে মুক্ত করা যাবে।

—**অম্লান কুসুম ঘোষ,**
বালি, হাওড়া।

With the best Compliments from :

A Well Wisher

কোলেস্টেরল সমস্যায় হোমিওপ্যাথি

ডাঃ প্রকাশ মল্লিক

রক্তে কোলেস্টেরলের মাত্রা অস্বাভাবিক থাকলে হৃদরোগ এবং স্ট্রোকের ঝুঁকি বাড়ায়। কিন্তু সম্প্রতি এক সমীক্ষায় জানা গেছে ট্রাইগ্লিসারাইডের ফ্লাকচুয়েশনের কারণে অনেক সময়ে স্মৃতি ভ্রংশের সম্ভাবনা দেখা দেয়।

কোলেস্টেরলের সমস্যাকে চিকিৎসা বিজ্ঞানের পরিভাষায় বলা হয় ডিসলিপিডিমিয়া। গোটা পৃথিবীতে প্রতি তিনজনের একজন কোলেস্টেরলের সমস্যায় ভোগেন। খাদ্যাভ্যাসের কারণে

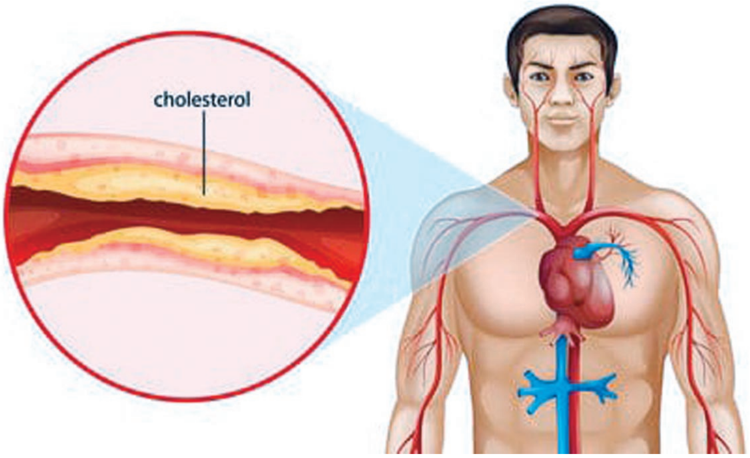

চল্লিশোর্ধ্ব ভারতীয় বা বাঙ্গালির মধ্যে ৫০ শতাংশের বেশি এর শিকার। কোলেস্টেরলের মাত্রা ঠিক রাখতে হিমশিম খান সিংহভাগ রোগী। অসুখটা কী, হলে কী করণীয়, তা নিয়ে বিশেষজ্ঞদের পরামর্শ এইরূপ :

কোলেস্টেরল কী : কোলেস্টেরল হলো চর্বি বা ফ্যাট (লিপিড) এবং প্রোটিনের জটিল যৌগ।

ডিসলিপিডিমিয়া কী ? কোলেস্টেরল বা লিপিডের অনেকগুলি উপাদান রয়েছে। প্রধান হলো হাই-ডেনসিটি ডেরাইভন্ ফ্যাট/লিপিড, প্রোটিনের সঙ্গে কোলেস্টেরল মিলিত হয়ে সৃষ্টি হয়—লাইপো-প্রোটিন নামক একটি জটিল যৌগের। রক্তে কোলেস্টেরলের মাত্রা নিরূপণের পরীক্ষা হলো—লিপিড প্রোফাইল টেস্ট। লাইপো-প্রোটিন (এইচ-ডি-এল), লো-ডেনসিটি লাইপো-প্রোটিন (এল ডি এল), টোটাল কোলেস্টেরল এবং ট্রাইগ্লিসারাইড (টি.জি)। রক্তে এগুলির যে কোনও একটি স্বাভাবিক মাত্রা বেড়ে বা কমে গেলে তাকে বলে ডিসলিপিডিমিয়া। তবে হাইপার লিপিডিমিয়াই বেশি দেখা যায় তাতে এইচ ডি এল কমে এল ডি এল ওটিজি বাড়ে।

কেন হয় ? খাদ্যাভ্যাস ও জীবনশৈলীর সমস্যায়। বড়ো ভিলেন বেশি মিষ্টি, ভাজাভুজি ও ময়দা খাওয়া। যাদের পরিবারে এই সমস্যা আছে তিনি যদি ধূমপান করেন কিংবা উচ্চরক্তচাপ/ডায়াবেটিস ও ওবেসিটি/ফ্যাটি লিভার ইত্যাদির শিকার হন, তাঁদের ডিসলিপিডিমিয়া হওয়ার আশঙ্কা।

গুড কোলেস্টেরল, ব্যাড কোলেস্টেরল মানে কী ? গুড কোলেস্টেরল হলো এইচ ডি এল যাতে ফ্যাট কম এবং প্রোটিন বেশি থাকে। তাই রক্তে এইচ ডি এল বেশি থাকা জরুরি। ব্যাড কোলেস্টেরল হলো এল ডি এল যাতে প্রোটিন কম, ফ্যাট বেশি থাকে। এটি কম থাকা দরকার।

ডিসলিপিডিমিয়া বোঝা যায় ? কোনো উপসর্গ নেই। ফলে ৪৫ বছর বয়সের পর বছরে একবার লিপিড প্রোফাইল পরীক্ষা না করলে বোঝার উপায় নেই। পরিবারে কারও থাকলে ধূমপায়ীদের এবং উচ্চ রক্তচাপ/ডায়াবেটিস/ওবেসিটি/ফ্যাটি লিভার থাকলে ৩৫ বছরের পর থেকে বছরে একবার টেস্ট করাতে হবে।

এর ঝুঁকি কোথায় ? লিপিড প্রোফাইলের অবনতি একদমই বোঝা যায় না। অথচ অবনতি হলে রক্তবাহিকার ভিতর জমে গিয়ে ক্লটের জন্ম দেয় ও রক্তবাহিকাগুলি সরু হয়ে যায় এবং তা থেকে হার্ট অ্যাটাক, স্ট্রোকের আশঙ্কা তৈরি হয়। তাই ডিসলিপিডিমিয়াকে 'সাইলেন্ট কিলার' বলা হয়।

কোলেস্টেরল নিয়ন্ত্রণ করার উপায় কী ? খাদ্যাভ্যাস ও জীবন শৈলীতে পরিবর্তন না আনলে মুশকিল। দরকারে ওষুধ খেতে হবে এবং কায়িক পরিশ্রম ও ব্যায়াম করতে হবে। বাড়াতে হবে হাঁটাহাঁটি। অন্য রোগ বা ওষুধের কারণে হলে মূল সমস্যা ঠিক করতে হবে।

কোলেস্টেরল বাড়লে কী খাবেন বেশি করে ? শাকসবজি, ফল, ছোটো মাছ এবং বার্লি বা ওটসের মতো হোল গ্রেন খেতে হবে। কাঁচা রসুনও উপকারী। খেতে হবে কাঠবাদাম, পাতলা দুধ (ডাবল টোনড্) বা ছানা, দই।

কী খাওয়া যায় না ? ভাজাভুজি, ময়দার তৈরি খাবার (লুচি, পরোটা, বিস্কুট, রুমালি রুটি) এড়িয়ে চলতে হবে। কেক, পেস্ট্রি, পিৎজা, বার্গার খাওয়া যাবে না। ফাস্ট/জাঙ্ক ফুড চলবে না। ঘি, মাখন, চিজ এড়িয়ে চলতে হবে। ভাজা মিষ্টি, রেডমিট, চিংড়ির মাথা চলবে না।

ডিম খাওয়া যাবে ? নিশ্চয়ই খাওয়া যাবে। তবে সেদ্ধ। বয়স ৩৫-এর কম হলে রোজ একটি খেলেও সমস্যা নেই। তারপরে সপ্তাহে তিনটে। অমলেট, পোচ খেলে সপ্তাহে বড়ো জোর একদিন।

লিপিডের মাত্রা কেমন ? এইচ ডি এল পুরুষদের ৬০ এবং মেয়েদের ৫০ মিগ্রা/ডেসিলিটার মাত্রার চেয়ে বেশি ভালো। ৪০-এর কমে খারাপ। এল ডি এল ৭০ মিগ্রা/ডেসিলিটার-এর চেয়ে কম থাকলে খুব ভালো। তবে ১০০-র বেশি থাকলে খারাপ। ট্রাইগ্লিসারাইড ১৫০ মিগ্রা/ডেসিলিটার-এর চেয়ে কম থাকা দরকার। টোটাল কোলেস্টেরল ১২৫-২০০ মিগ্রা/ডেসিলিটার মাত্রার মধ্যে থাকা স্বাভাবিক।

হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা : কারণ, লক্ষণ ও মায়াজম মিলিয়ে হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা করলে কোলেস্টেরলকে নিয়ন্ত্রণে রাখা সম্ভব। তবে উপযুক্ত ডাক্তারের পরামর্শ নিয়েই হোমিওপ্যাথি ওষুধ খাওয়া উচিত।

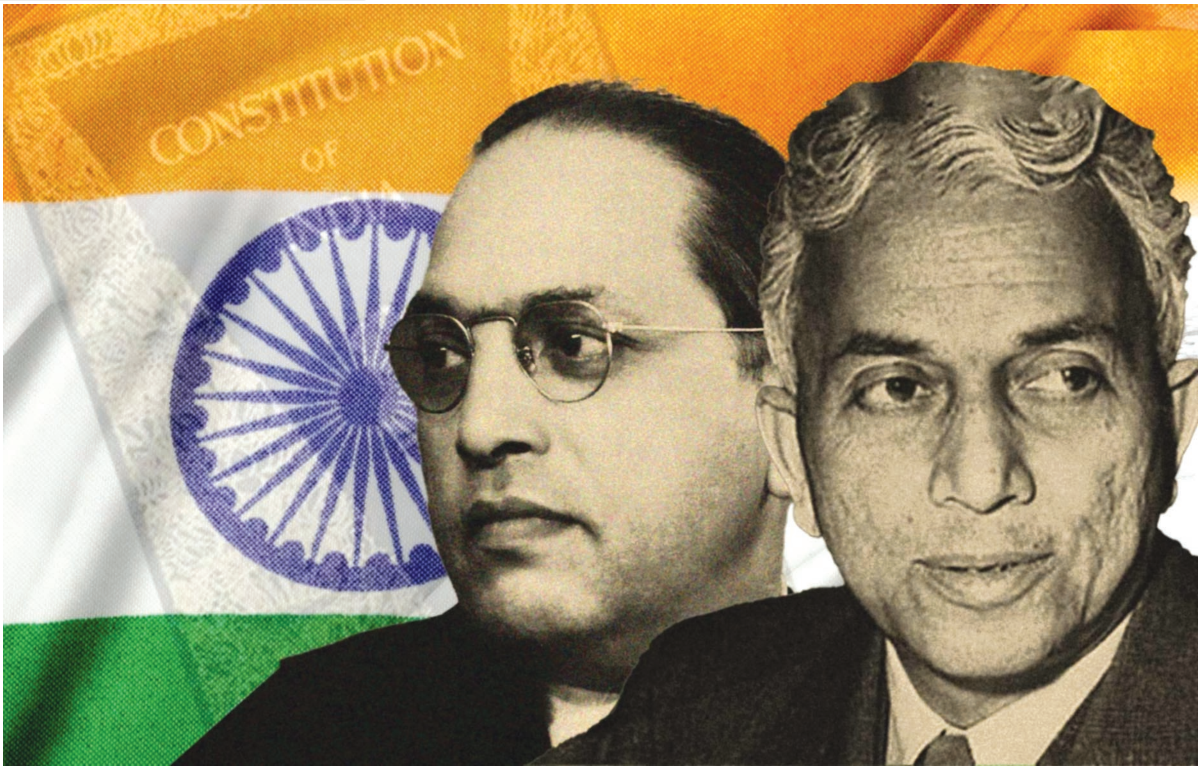

সংবিধানের প্রকৃত জনক কে?

নন্দলাল ভট্টাচার্য

ভারতীয় সংবিধানের জনক কে? এমন জিজ্ঞাসায় হয়তো অনেকেই হেসে উঠবেন। স্মরণ করিয়ে দেবেন, 'সাতকাণ্ড রামায়ণ পড়ে সীতা কার বাপ'---এই বাংলা প্রবাদ বা বাগধারাটিকে। অর্বাচীনের মতো প্রশ্ন করায় মৃদু ভর্ৎসনাও জুটতে পারে কপালে। হয়তো শুনতে হবে একটা মিঠেকড়া ধমক— আম্বেদকর যে ভারতীয় সংবিধানের জনক, এ কথাটিও জানা নেই!

আত্ম-মূর্খামির তকমা নিয়েই সংবিধান রচনার ইতিহাসটিতে চোখ বোলাতে হয়। ইতিহাসে সবই অমলিন। আবার কর্তার ইচ্ছায় কর্মের মতোই ইতিহাস রচনাকারের মাথায় থাকে একটি হিমশীতল হাত, যা বারবার মনে করিয়ে দেয়, যাদের পোষকতায় এই ইতিহাস রচনা, ভুলেও তাদের নির্দেশের বাইরে যেয়ো না। যদি যাও তাহলে হয়তো সত্য জবাব দিতে গিয়ে জ্ঞানটাই চলে যাবে।

সব দেশে, সব ভাষায় রচিত ইতিহাসের ক্ষেত্রেই বিষয়ের কালসাপের মতোই ক্রুর রক্তাক্ত এবং হিংস্র একজোড়া চোখের তাড়নাটি বড়ো তীব্র। তাই রচনা হিসেবে যা পাওয়া যায়, তাতে প্রকৃত ইতিহাসটা পাওয়া যায় না। সেই ইতিহাস পাওয়া যায় বাজে আবর্জনা বলে যা বর্জন করা হয় সেই ফেলে দেওয়া কাগজের ঝাঁপিতে। কিন্তু কে আর সাধ করে বাজে কাগজের ঝুড়ি হাতড়ায়? হাতড়ালে জানা যাবে ভারতীয় সংবিধানের প্রকৃত রূপকার আম্বেদকর নন। তিনি নিঃসন্দেহে একজন দক্ষ রূপশিল্পী, কিন্তু সংবিধানের প্রকৃত জনক নন। তিনি কেবল একটি চাপিয়ে দেওয়া অভিধার ভার বয়ে চলেছেন। ভারতীয় সংবিধানের মূল রচনাকারের নাম স্যার বেনেগাল নরসিং রাও। সংবিধান খসড়া কমিটির উপদেষ্টা হিসেবে তিনিই মূল খসড়াটি রচনা করেন। একথা প্রকারান্তরে স্বীকার করে নিয়েছেন স্বয়ং আম্বেদকরও।

১৯৪৯ খ্রিস্টাব্দের ২৫ নভেম্বর গণপরিষদে সমাপ্তি ভাষণে আম্বেদকর বলেন, 'The credit that is given to me does not really belong to me. It belongs partly to Sir B. N. Rau the Constitutional Advisor to the Constituent Assembly who prepeared a rough draft of the Constitution for the consideration of the drafting committee.' অর্থাৎ সংবিধানের প্রকৃত রচনাকার বি এন রাও। তিনিই সংবিধানের প্রথম খসড়াটি তৈরি করে দেন। সেই খসড়ার সঙ্গে বিভিন্ন কমিটির সুপারিশ এবং অন্যান্যদের নাম প্রস্তাব ও বক্তব্যর প্রয়োজনীয় অংশগুলি নিয়ে তৈরি হয় সংবিধান। সংবিধানের সেই খসড়াই গণপরিষদে পেশ করেন বাবাসাহেব আম্বেদকর খসড়া কমিটির সভাপতি এবং তৎকালীন আইনমন্ত্রী হিসেবে। তার থেকেই তাঁকে সংবিধানের জনক হিসেবে প্রচার করা শুরু হয়। আর সেই প্রচারের পিছনে ছিল একটি সুকৌশলী পরিকল্পনা। অভিযোগ, প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহরু বস্তুত রাজনৈতিক ফয়দা

তোলার জন্যই এই প্রচার শুরু করেন। এবং বুঝে অথবা না বুঝেই তাঁর মন্ত্রীসভার সদস্যরা এবং কংগ্রেস নেতারা নেহরুর এই কথার সুরে সুর মেলান। নেহরুর এই কৌশল বুঝতে পারলেও বিরোধী দলগুলিরও এর বিরোধিতা করা সম্ভব হয়নি। বিষয়টি এতই স্পর্শকাতর যে, বিরোধিতা করলেই দলিতবিরোধী হিসেবে চিহ্নিত হওয়ার আশঙ্কা তীব্র এবং সেটা হলে নির্বাচনে তাদের সমর্থন হারানোর ভয় বিদ্যমান অবশ্যই। তাই সকলেই বিষয়টি মেনে চলেছেন প্রায় নীরবেই।

বি এন রাও-কে কৃতিত্ব না দেওয়ার বেশ কয়েকটি কারণ ছিল। প্রথমত রাও কোনো রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব নন। তিনি একজন বিশিষ্ট আমলা, আইনজ্ঞ, কূটনীতিক এবং পণ্ডিত মানুষ। সে কারণে রাজনীতির ময়দানে তাঁকে দূরে রাখাটাই সঙ্গত। জনগণও সাধারণভাবে আমলাদের পেছনে থাকেন না। স্বভাবতই জন-প্রতিবাদেরও কোনো ভয় থাকে না। ফলে তাঁদের যোগ্য সম্মান থেকে বঞ্চিত করা অনেক সহজ।

দ্বিতীয়ত, বি এন রাও এক ব্রাহ্মণ পরিবারের সন্তান। অর্থাৎ উচ্চবর্ণের মানুষ। অন্য দিকে আম্বেদকর দলিত সম্প্রদায়ের। তাই তাঁকে সম্মান দিয়ে ভোটের বাক্সে দলিত সম্প্রদায়ের সমর্থনের ঢল নামবে এই অঙ্কেও রাওকে বঞ্চিত করা হয় তাঁর যোগ্য সম্মান থেকে।

আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়, স্বাধীনতার পর যে সংবিধান রচিত হলো মূলত জাতীয়তাবোধের সাফল্যের কাহিনি হিসেবেই। সেক্ষেত্রে ইংরেজ সরকারের একজন প্রাক্তন আমলাকে সংবিধান রচনার কৃতিত্ব দিলে জাতীয়তাবোধের গৌরবে 'গ্রহণ' লাগারও একটা ভয় সম্ভবত সক্রিয় ছিল সমস্ত রাজনৈতিক দলের নেতাদের মধ্যেই।

কারণ আরও একটা ছিল বলে অনেকে মনে করেন। সংবিধানের মূল স্থপতিকার হলেও রাজনীতির চেয়েও রাও দায়বদ্ধ ছিলেন তাঁর আদর্শবাদের কাছে। সংবিধানের মূল মেজাজটির স্বার্থরক্ষায় তিনি ছিলেন সতত সচেষ্ট। স্বাধীন দেশের জন্য একটি সর্বাঙ্গসুন্দর সংবিধান প্রণয়ন ছিল তাঁর লক্ষ্য। তাই আগাগোড়া তিনি তৎকালীন রাজনৈতিক সমস্যাগুলি সমাধানের চেষ্টা করেছেন। রাজনৈতিক নেতাদের মতো সমস্যা জিইয়ে রেখে ফয়দা তোলার কোনো প্রয়াসই ছিল না তাঁর মধ্যে। আর সে কারণেই রাজনৈতিক নেতারা মনে মনে তাঁকে সমীহ করলেও প্রচারের আলো থেকে তাঁকে দূরে রাখার দিকেই বেশি মনোযোগী ছিলেন।

বি এন রাওয়ের সাংবিধানিক প্রজ্ঞা, মানবপ্রেম ও দূরদৃষ্টি সম্পর্কে নেহরুর একটা স্পষ্ট ধারণা ছিল। জানতেন, রাজনৈতিক 'ক্রূরতা' বা রাজনৈতিক নেতাদের স্বার্থ রক্ষার চেয়েও রাও অনেক বেশি সচেতন দেশের সাধারণ মানুষের কল্যাণের বিষয়ে। সে কারণেই তিনি সংবিধানের মূল কাঠামোটি তৈরি করলেও জাতীয়তাবাদী রাজনৈতিক নেতারাই সংবিধানের প্রকৃত রূপটি দিয়েছেন, একথা প্রচারেই সচেষ্ট ছিলেন নেহরু এবং তাঁর অনুগত সঙ্গীসাথীরা। সুকৌশলে তাঁরা সকলেই বি এন রাও-কে ইংরেজ ছাঁচে ঢালা একজন অনুগত আমলা বলেই উল্লেখ করেছেন বারবার।

১৯৫৩ খ্রিস্টাব্দের ৩০ নভেম্বর আন্তর্জাতিক আদালতের বিচারক থাকার সময়ই সুইজারল্যান্ডের জুরিখে রাও প্রয়াত হন। তখনও প্রধানমন্ত্রী নেহরু লোকসভায় শোকজ্ঞাপনের সময় তাঁকে সংবিধানের রূপকার নন, দক্ষ আমলা—'Perfect civil servant' আখ্যা দিয়ে তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা জানান।

নেহরু সেভাবে স্বীকার না করলেও গণপরিষদের সভাপতি হিসেবে ডঃ রাজেন্দ্র প্রসাদ কিন্তু ১৯৪৯-এর ২৬ নভেম্বর রাওয়ের কাজকে স্বীকৃতি দিয়ে তাঁকে ধন্যবাদ জানান। বলেন, সশ্রদ্ধ মানসিকতায় সংবিধান রচনায় শ্রীরাও কেবল তাঁর জ্ঞান ও শিক্ষাকেই প্রয়োগ করেননি, সেই সঙ্গে কমিটির অন্যান্য সদস্যদেরও তাঁদের কর্তব্য পালনে নিরলসভাবে সাহায্য করেছেন। রাজেন্দ্রপ্রসাদ বলেন, রাও-ই ভবিষ্যতের যোজনার পূর্ণ রূপটি দর্শনের জ্ঞানদীপ্তিতে ভারতীয় সংবিধানের ভিত্তিভূমিটি তৈরি করে দেন।

সংবিধানের জনক হিসেবে কথিত বাবাসাহেব আম্বেদকরও বারবারই স্বীকার করেন, খসড়া সংবিধানটি খুঁটিয়ে দেখেছেন সংবিধান উপদেষ্টা স্যার বি. এন রাও। এই সংবিধানকে বিশ্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সংবিধান হিসাবে প্রতিষ্ঠা করার জন্য নানাভাবে চেষ্টা করেছেন তিনি।

এসব উক্তি থেকে স্পষ্ট বোঝা যায়, সম্পূর্ণ রাজনৈতিক কারণে কিছুটা পরিকল্পিতভাবেই রাওকে তাঁর প্রকৃত স্বীকৃতি থেকে বঞ্চিত করলেও, দেশের ইতিহাসে তাঁর নাম সোনার জলেই লেখা থাকবে।

ফেরা যাক সংবিধান রচনা প্রক্রিয়ার ঘটনাবলীর কথায়। তীব্র রাজনৈতিক টানাপোড়েন ও সংগ্রামের শেষে স্বাধীনতার আলো জ্বলে ওঠে। স্বাধীন দেশের সংবিধান তৈরির জন্য গঠিত হয় গণ পরিষদ। সেটা ১৯৪৬-এর কথা।

গণপরিষদ গঠনের আগে থেকে দেশের সবচেয়ে বড়ো দুটি রাজনৈতিক দল কংগ্রেস এবং মুসলিম লিগ পারস্পরিক দ্বন্দ্বে জড়িয়ে পড়ে। পাকিস্তানের দাবিতে মুসলিম লিগ একগুঁয়ে মনোভাব নেয়। ফলে দেখা দেয় এক ধরনের অনিশ্চয়তা। তারই মধ্যে ১৯৪৬ খ্রিস্টাব্দে গণপরিষদ গঠনের জন্য ভোট হয়ে যায়। মুসলিম লিগ নির্বাচনে লড়লেও গণপরিষদের কাজে সহযোগিতা করে না। ১৯৪৬-এর ৯ ডিসেম্বর গণপরিষদের যে প্রথম অধিবেশন হয় তা বয়কট করে মুসলিম লিগ।

অবস্থা ক্রমেই জটিল হয়ে ওঠে। সে সময় শেষ ইংরেজ গভর্নর জেনারেল মাউন্টব্যাটনের সূত্রে ভারত ভাগের মধ্য দিয়ে স্বাধীনতা আসে। শুরু হয় সংবিধান রচনার প্রক্রিয়া। ১৯৪৭-এর ১৪ আগস্ট গণপরিষদের বৈঠক বসে। সংবিধান তৈরির বিভিন্ন কাজগুলি ঠিক ঠিক করার জন্য বাইশটি কমিটি গঠিত হয়। এর মধ্যে পাঁচটি হলো প্রধান। যেমন, সংবিধান খসড়া কমিটি, ইউনিয়ন পাওয়ার কমিটি, ইউনিয়ন সংবিধান কমিটি, প্রাদেশিক সংবিধান কমিটি, মৌলিক অধিকার-সংখ্যালঘু-উপজাতি ও এক্সক্লুড এরিয়া সংক্রান্ত উপদেষ্টা কমিটি।

একদিক থেকে এই পাঁচ প্রধান কমিটির মধ্যে আবার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণটি হলো সংবিধান খসড়া কমিটি। সাত সদস্যের খসড়া কমিটির সভাপতি ছিলেন বাবাসাহেব আম্বেদকর। অন্য ছ' জন হলেন কে এম মুন্সি, মহম্মদ সাদুল্লাহ, আল্লাদি কৃষ্ণস্বামী আইয়ার, গোপালস্বামী আয়েঙ্গার, বি এল মিটার এবং ডি পি খৈতান। এরা সকলেই সুপণ্ডিত। আইন ও প্রশাসনের কাজে অত্যন্ত দক্ষ। কমিটি গঠনের কিছুদিন পরেই বি এল মিটার ইস্তফা দেন এবং ডি পি খৈতানের মৃত্যু হয়। ওই দুই শূন্য পদে নতুন সদস্য হন এন মাধব রাও এবং টি টি কৃষ্ণমাচারি।

গণপরিষদ গঠনের পরই উপদেষ্টা হিসেবে একজন সংবিধান বিশেষজ্ঞের প্রয়োজন অনুভূত হয়। তখনই ওই পদের জন্য স্যার বেনেগাল নরসিং রাওয়ের কথা মাথায় আসে। বেনেগাল রাও একজন দক্ষ আমলা, আইনবিদ এবং সংবিধান বিশেষজ্ঞ। নানা গুরুত্বপূর্ণ প্রশাসনিক দায়িত্ব সামলানো বি এল রাও তখন সদ্য অবসর নিয়েছেন গভর্নর জেনারেলের অফিসের সচিব পদ থেকে। ১৯৩৫-এর ভারত শাসন আইন গ্রহণের সময় থেকেই সংবিধান সংক্রান্ত কাজে রাও অসাধারণ কুশলতার পরিচয় দেন। ওই সময় ভারতে এই বিষয়ে তাঁর চেয়ে দক্ষ আর কেউ ছিলেন না। সে কারণে সংবিধান রচনার উপদেষ্টা হিসেবে সকলেই চান তাঁকে।

রাওয়ের কাছ থেকে প্রথমে সেরকম সাড়া পাওয়া যায়নি। নেহরু ও প্যাটেল অনেক বলে তাঁকে রাজি করান। অবশ্য রাও এব্যাপারে কয়েকটি শর্ত দেন। স্পষ্টভাষায় তিনি বলেন, গণপরিষদের সচিবালয়টি একটি অ-রাজনৈতিক সংগঠন। দলমত, পেশা নির্বিশেষে সকলেরই থাকবে এখানে সমান অধিকার। সকলেই হবেন সবকিছু দেখার বা জানার অধিকারী। রাজনীতিকরা একাজে কোনোরকম হস্তক্ষেপ করতে পারবেন না। শর্তগুলি মেনে নেন সকলেই। তারপর আর কোনো আপত্তি ছিল না। বিশিষ্ট আমলা, আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন আইনবিদ, কূটনীতিক, স্যার বেনেগাল নরসিং রাও কোনোরকম বেতন বা অর্থ না নিয়েই সংবিধানের খসড়া কমিটির উপদেষ্টা এবং সচিবালয়ের প্রধান হিসেবে কাজে ঝাঁপিয়ে পড়েন।

এটাই তাঁর বৈশিষ্ট্য। যে কাজেই হাত দেন, তা করেন মন-প্রাণ দিয়ে। সে কাজে বিন্দুমাত্র ফাঁকি দিতেন না তিনি। সংবিধান রচনার উপদেষ্টা হিসেবেও একই ভূমিকা নেন তিনি। বস্তুত আপন মেধায় তিনি প্রায় একাই সংবিধানের একটি খসড়া তৈরি করেন। সে কথায় যাওয়ার আগে বি এন রাও-এর জীবন ও কর্মধারার কথা একবার স্মরণ করা যাক।

বি এন রাওয়ের জন্ম ১৮৮৭ খ্রিস্টাব্দে তৎকালীন মাদ্রাজ রাজ্যের ম্যাঙ্গালোরে এক সম্ভ্রান্ত কন্নড় সারস্বত ব্রাহ্মণ পরিবারে। তাঁর বাবা ছিলেন শহরের নামকরা চিকিৎসক। সমাজেও ছিল তাঁর বেশ প্রভাব। ছেলেবেলা

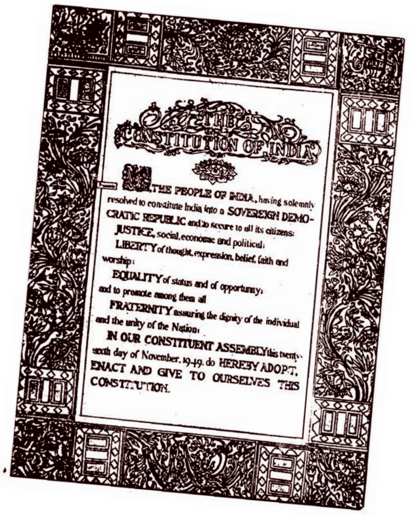

THE CONSTITUTION OF INDIA

WE, THE PEOPLE OF INDIA, having solemnly resolved to constitute India into a SOVEREIGN DEMOCRATIC REPUBLIC and to secure to all its citizens:

JUSTICE, social, economic and political;

LIBERTY of thought, expression, belief, faith and worship;

EQUALITY of status and of opportunity; and to promote among them all

FRATERNITY assuring the dignity of the individual and the unity of the Nation;

IN OUR CONSTITUENT ASSEMBLY this twenty-sixth day of November, 1949, do HEREBY ADOPT, ENACT AND GIVE TO OURSELVES THIS CONSTITUTION.

থেকেই পড়াশোনায় অত্যন্ত মেধাবী বি এন রাও ১৯০৫ খ্রিস্টাব্দে ইংরেজি, পদার্থবিজ্ঞান ও সংস্কৃতে ট্রিপল ফার্স্ট ডিগ্রি নিয়ে স্নাতক হন। পরের বছর তিনি গণিতে অতিরিক্ত প্রথম ডিগ্রি পান। এরপর বৃত্তি নিয়ে ১৯০৯ খ্রিস্টাব্দে কেমব্রিজের ট্রিনিটি কলেজ থেকে ট্রাইপস পান। ওই বছরই তিনি আইসিএস পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে ভারতে ফিরে আসেন। শুরু হয় কর্মজীবন।

রাও ছিলেন কাজপাগল আদ্যন্ত এক সৎ সরকারি আমলা। সেটা তাঁর কর্মজীবনের প্রথম দিকের কথা। তাঁকে মাদ্রাজে একটি পদে নিয়োগ করা হয়। মাদ্রাজে কাজে যোগ দিয়ে নানাদিক থেকেই তাঁর সুবিধা হতো। কিন্তু বিধি অনুযায়ী কাউকে তাঁর বাসস্থান অঞ্চলে নিয়োগ করা হয় না। সে কারণে রাও আইসিএস কমিশনে চিঠি লিখে জানান, মাদ্রাজ রাজ্যেই তাঁর জন্ম। তাঁর বাবার এখানে বহু রোগী এবং বন্ধু-বান্ধব রয়েছে। এখানকার নানা অঞ্চলে তাঁদের বহু আত্মীয়স্বজনও রয়েছে। সেকারণে এখানে তাঁর পক্ষে নিরপেক্ষভাবে কাজ করা সম্ভব নয় বলেই তাঁর মনে হয়। হয়তো ভুল করেই তাঁকে তাঁর নিজের রাজ্যে নিয়োগ করা হয়েছে। তাই তাঁকে অন্য কোথাও বদলি করা হোক।

হলোও তাই। আর তারই ফলে তিনি পেলেন সৎ কর্মীর স্বীকৃতি। পেলেন সংবিধান সংক্রান্ত কাজ করার সুযোগ। পরবর্তীকালে সেই অভিজ্ঞতাই তাঁর কাজে লাগে ভারতের সংবিধান প্রণয়নের সময়।

কর্মজীবনে তিনি ভারতীয় বিধিবদ্ধ সংহিতার (১৯৩৫–৩৭) আগাগোড়া সংশোধন করে ১৯৩৮ খ্রিস্টাব্দে 'নাইট' উপাধি পান। ১৯৩৯ খ্রিস্টাব্দে তিনি কলকাতা হাইকোর্টের বিচারক পদে যোগ দেন। সাংবিধানিক নজির, ভারতে মানবিক অধিকার ইত্যাদি বিষয়ে বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ প্রবন্ধ লেখেন তিনি।

১৯৪৪--৪৫ পর্যন্ত তিনি ছিলেন জম্মু-কাশ্মীর রাজ্যের প্রধানমন্ত্রী। মহারাজ হরি সিংহের সঙ্গে মতান্তরের কারণে সে কাজে ইস্তফা দেন তিনি।

১৯৫২ খ্রিস্টাব্দের ফেব্রুয়ারি থেকে দ্য হেগে আমৃত্যু আন্তর্জাতিক আদালতের বিচারক ছিলেন। রাষ্ট্রসঙ্ঘে ভারতের প্রতিনিধি হিসেবে নিরাপত্তা পরিষদে সভাপতিত্বও করেছেন তিনি। রাষ্ট্রসঙ্ঘের মহাসচিব পদের জন্যও নাম উঠেছিল তাঁর।

গণপরিষদের সাংগঠনিক উপদেষ্টা হিসেবে কাজ করার সময় সংবিধানের খসড়া তৈরির জন্য প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা অর্জনের জন্য তিনি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা, আয়ারল্যান্ড ও যুক্তরাজ্যে যান।

গণপরিষদের বিভিন্ন ঘোষণা থেকে জানা যায়, সংবিধানের মূল খসড়াটি তৈরি করেন বি এন রাও। ১৯৪৭-এর ২৯ আগস্টের বিজ্ঞপ্তি থেকে জানা যায়, ''সাংবিধানিক উপদেষ্টার তৈরি সংবিধানের খসড়া পর্যালোচনা ও বিশ্লেষণের জন্য আম্বেদকরের নেতৃত্বে গঠিত সংবিধান খসড়া কমিটিকে ইতিমধ্যে পরিষদে গৃহীত বিভিন্ন প্রস্তাব এবং অন্যান্য বিষয় সংযোজন, পরিমার্জন করে সম্পাদিত সংবিধানটি গণপরিষদে পেশ করতে হবে।''

গণপরিষদের ওই ঘোষণা থেকে স্পষ্ট, মূল খসড়াটি বি এন রাওয়ের তৈরি। ওই খসড়ার ভিত্তিতে সংশোধন, সংযোজনের মধ্য দিয়ে মোট তিনটি খসড়া রচনা, পাঠ এবং বিবেচনার পরই তৈরি হয় মূল সংবিধান। সেটিই পেশ করেন আম্বেদকর। ১৯৪৯ এর ২৬ নভেম্বর গৃহীত হয় সংবিধানের ওই চূড়ান্ত রূপটি। পরিষদের অধিবেশনে সমাপ্তি ভাষণে আম্বেদকর সংবিধান রচনার কৃতিত্ব তাঁর একার নয়, একথা স্পষ্টভাষায় জানিয়ে দেন।

অথচ সাংবিধানিক আদর্শের চেয়েও রাজনৈতিক প্রয়োজনকে বেশি গুরুত্ব দিতেই কার্যত বি এন রাওয়ের কৃতিত্বকে স্বীকৃতি জানানো হয়নি। সন্দেহ নেই এটা ইতিহাসের এক বিরাট কারচুপি। এক অর্থে এটি ইতিহাসের এক কলঙ্ক হিসেবেই দগ্ধ করবে বিবেককে আজ এবং চিরকালই। ■

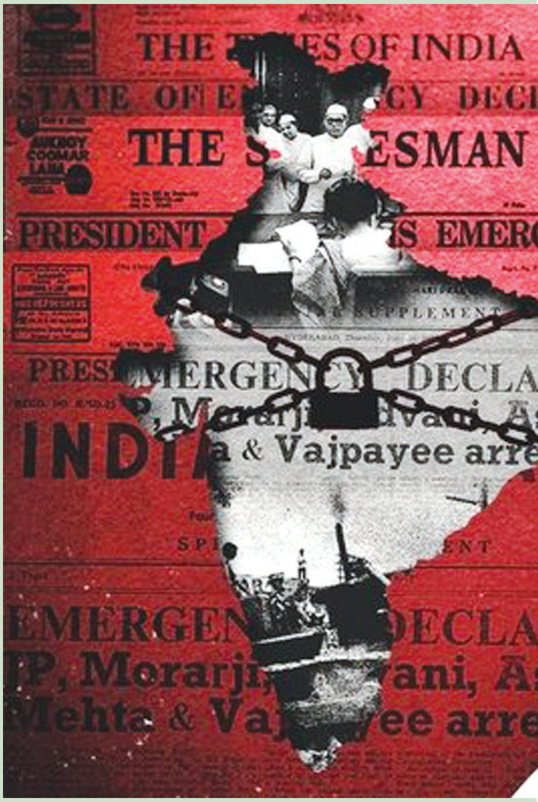

দেশের স্বার্থের বদলে দল ও ব্যক্তিস্বার্থে সংবিধান সংশোধন

ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের কিছু বিচিত্র কর্মকাণ্ডের ইতিহাস

অধ্যাপক বিমল শঙ্কর নন্দ

প্রসিদ্ধ ব্রিটিশ আমেরিকার দার্শনিক এবং রাজনৈতিক কর্মী টমাস পেইন (Thomas Paine) মন্তব্য করেছিলেন ‘‘Every age and generation must be free to act for itself in all cases as the ages and generations which precede it’’. অর্থাৎ সকল যুগে মানুষের যুগোপযোগী ভূমিকা পালনের স্বাধীন সুযোগ থাকা দরকার। কারণ সমাজের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে মানুষের চিন্তাচেতনা, আশা-আকাঙ্ক্ষার পরিবর্তন ঘটে। এই পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গতি বজায় রাখতে গেলে রাজনৈতিক ব্যবস্থাতেও পরিবর্তন আনার প্রয়োজন হয়। দেশের সংবিধানেরও প্রয়োজনীয় সংশোধন ঘটাতে হয় যাতে দেশের সংবিধান সমাজ বিকাশের পক্ষে বাধা না হয়ে সেই বিকাশকে ত্বরান্বিত করতে পারে। তাই দেশের সংবিধান এবং সাংবিধানিক ব্যবস্থার পরিবর্তন আনতে হয় দেশের স্বার্থে এবং সময়ের চাহিদা অনুযায়ী। কোনো বিশেষ রাজনৈতিক দল, রাজনৈতিক নেতা বা কোনো রাজনৈতিক পরিবারের কথা মাথায় রেখে সংবিধানকে বদলে ফেলা উচিত নয়। অথচ দুর্ভাগ্যজনক হলেও এটা সত্য যে শতাধিকবার ভারতের সংবিধান সংশোধিত হয়েছে একটি বিশেষ রাজনৈতিক দলের স্বার্থের কথা বিবেচনা করে। সেই দলের নেত্রীর স্বৈরাচারী শাসনকে নিষ্কণ্টক করতে সংবিধানকে বদলে ফেলার নজির উন্নত গণতন্ত্রের খুব একটা নেই। একনায়কতান্ত্রিক ব্যবস্থায় এগুলো প্রায়শই হয়। কিন্তু ভারতের উন্নত গণতন্ত্রেও এই ঘটনা ঘটেছিল কংগ্রেস শাসনে। যে সময়ে ভারতের প্রধানমন্ত্রী ছিলেন শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী। ইন্দিরা গান্ধীর নেতৃত্বাধীন কংগ্রেস জরুরি অবস্থা থাকাকালীন সময়ে সংবিধানের ৪২তম সংশোধনীর মাধ্যমে সংবিধানের খোলনলচেটাকেই বদলে ফেলার চেষ্টা চালিয়েছিল। ৪২ তম সংশোধনীতে ভারতীয় সংবিধানে এত বদল আনা হয়েছিল যে অনেকে এই সংশোধনীকেই একটি ‘মিনি সংবিধান’ বলে অভিহিত করেন। এই প্রবন্ধে আলোচনা করবো কীভাবে তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত এবং তাঁর দলের স্বার্থে ভারতের সংবিধান তথা সাংবিধানিক কাঠামোটিকে বদলে একে এক স্বৈরাচারী, একদলীয় ও আধিপত্যমূলক ব্যবস্থায় পরিণত করতে চেয়েছিলেন।

১৯৭৫ সালের ২৫ জুন ইন্দিরা গান্ধীর নেতৃত্বাধীন কংগ্রেস সরকার ভারতের অভ্যন্তরীণ গোলযোগের অজুহাতে জরুরি অবস্থা জারি করে। এই জরুরি অবস্থা জারি করার প্রধান উদ্দেশ্যই ছিল ইন্দিরা গান্ধীর শাসনকে দুর্নীতি ও স্বৈরাচারী মনোভাবের বিরুদ্ধে লোকনায়ক জয়প্রকাশ নারায়ণের নেতৃত্বে যে ‘পরিপূর্ণ বিপ্লব’ আন্দোলন পরিচালিত হচ্ছিল এবং যে আন্দোলন জনমনে অভূতপূর্ব উন্মাদনা তৈরি করেছিল তাকে যে কোনো উপায়ে চাপা দেওয়া। পুলিশ এবং আধা সামরিক বাহিনী প্রয়োগ করেও এই আন্দোলনকে চাপা দেওয়া সম্ভব হয়নি। ফলে সংবিধানের ৩৫২ ধারার অপপ্রয়োগ করে জরুরি অবস্থা জারি করে সমস্ত বিরোধী নেতা এবং বিরোধী দলের হাজার হাজার কর্মীকে জেলে পাঠিয়ে, সেন্সরশিপ চালুর মাধ্যমে সংবাদপত্রের কণ্ঠরোধ করে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনার চেষ্টা চালিয়েছিলেন শ্রীমতী গান্ধী।

যে কোনো স্বৈরাচারী শাসকের মতো শ্রীমতী গান্ধীরও ছিল ক্ষমতা হারানোর ভয়। ক্ষমতা হারালে নিজেদের সমস্ত অপকর্মের জন্য জবাবদিহি করার ভয়, তাই তিনি চাইছিলেন তার স্বৈরাচারী শাসন যাতে প্রজ্বলিত হয়। সংবিধানে বদল এনে এমন একটা ব্যবস্থা তৈরি করা যায় যাতে তাঁর নেতৃত্বাধীন কংগ্রেস বহুদিন ক্ষমতায় থেকে যায়। একটা আপাত গণতান্ত্রিক কাঠামো রেখে দিয়ে একটি একদলীয় আধিপত্যমূলক ব্যবস্থা কায়েম করা সম্ভব হয়। ১৯৭১ সালের লোকসভা নির্বাচনে বিপুল জয় পাওয়ার পরেই ইন্দিরা গান্ধী তাঁর একাধিক বক্তৃতায় কিছু নতুন শব্দ কিংবা ধারণার প্রয়োগ করেছিলেন। এই ধরনের একটি ছিল ‘কমিটেড ব্যুরোক্রেসি’-র ধারণা। অর্থাৎ রাজনৈতিক প্রশাসন যা নির্দেশ দেবে স্থায়ী প্রশাসন অর্থাৎ ব্যুরোক্রেসি অর্থাৎ আমলাতন্ত্র যা অক্ষরে অক্ষরে মেনে চলবে। তাদের নিজস্ব চিন্তা প্রয়োগের কোনো সুযোগই নেই। ইন্দিরা গান্ধী ‘কমিটেড জুডিশিয়ারি’ বা দায়বদ্ধ বিচার বিভাগের কথা সরাসরি না বললেও একাধিক বক্তব্যে স্পষ্ট করেই বলেছিলেন যে বিচার বিভাগের উচিত উন্নয়নের কাজে সরকারের সঙ্গে সহযোগিতা করা। কারণ ইন্দিরা গান্ধীর বহু সিদ্ধান্ত সুপ্রিম কোর্ট বাতিল করে দিচ্ছিল। তাই বিচার বিভাগের ক্ষমতা খর্ব করার প্রবল ইচ্ছা তৈরি হয়েছিল ইন্দিরা গান্ধীর মনে। এই সময় ইন্দিরার অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ কংগ্রেস নেতা বসন্ত শাঠেকে দিয়ে বলানো হচ্ছিল যে ভারতকে শক্তিশালী দেশে পরিণত করতে গেলে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের ধাঁচে রাষ্ট্রপতি শাসিত ব্যবস্থা চালু করা দরকার। ইন্দিরা গান্ধী এটা জানতেন যে ভারতের সংবিধান রচয়িতাগণ এদেশে অনেক ভাবনাচিন্তার মাধ্যমে ওয়েস্টমিনস্টার মডেল অর্থাৎ ব্রিটেনের আদলে সংসদীয় ব্যবস্থা চালু করেছিলেন। কারণ দীর্ঘদিনের ব্রিটিশ শাসনে ভারত এই ব্যবস্থার সঙ্গেই পরিচিত ছিল, এখানে রাষ্ট্রপতি শাসিত ব্যবস্থা চালু করলে

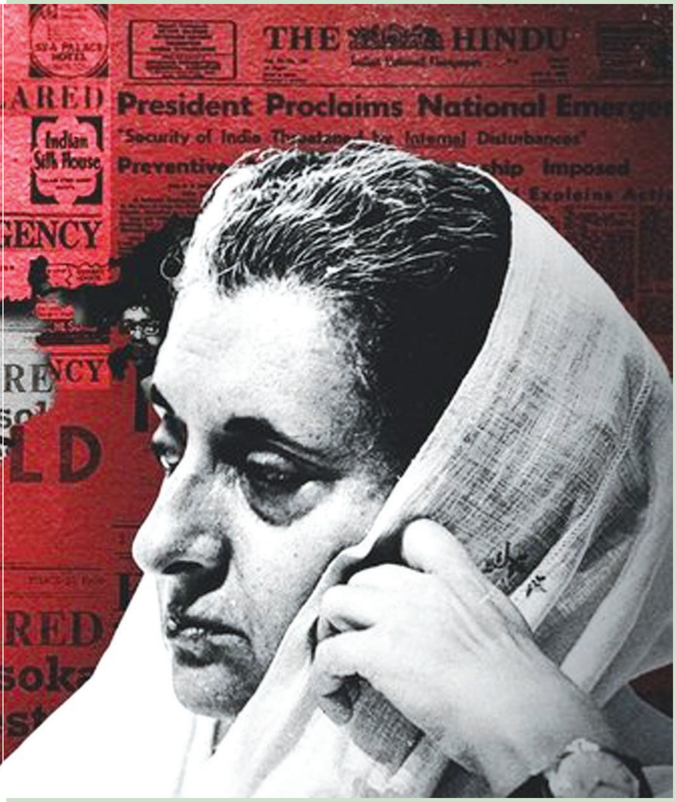

স্বৈরাচার মাথা চাড়া দিতে পারে। ইন্দিরা গান্ধী জানতেন যে ভারতে সংসদীয় ব্যবস্থা বাতিল করে রাষ্ট্রপতি শাসিত ব্যবস্থা চালু করা অত্যন্ত কঠিন। তাতে দেশে প্রবল বিতর্ক দেখা দেবে। তাঁর পক্ষে সবচেয়ে সহজ ছিল সংসদীয় ব্যবস্থাকেই এমনভাবে বদলে ফেলা যাতে সংসদীয় কাঠামোর মধ্যে রাষ্ট্রপতিশাসিত ব্যবস্থা চালু করা যায়। এই লক্ষ্যে সংবিধানের অনেকগুলো ধারাকে সংশোধন করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হলো। এই উদ্দেশ্যে কেন্দ্রের কংগ্রেস সরকার ১৯৭৬ সালে একটি কমিটি গঠন করে। তৎকালীন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী সর্দার সরণ সিংহের নেতৃত্বে ১২ সদস্যের একটি কমিটি গঠন করা হয়। এই কমিটির অন্যান্য সদস্যরা ছিলেন সিদ্ধার্থ শঙ্কর রায়, ভি.এন. গ্যাডগিল, বি. এন. ব্যানার্জি, দীনেশ গোস্বামী, ডি. পি. সিং, সি. এম. স্টিফেন, এইচ. আর. গোখেল, রজনী প্যাটেল, ভি. এ. সইদ মহম্মদ, এ. আর আনতুলে এবং বসন্ত শাঠে। কমিটির সদস্যদের নাম দেখলেই বোঝা যায় এরা প্রত্যেকেই ছিলেন ইন্দিরা গান্ধীর একান্ত আস্থাভাজন। এঁদের দিয়ে মনোমতো সুপারিশ করিয়ে নেওয়া সহজ ছিল। বাস্তবে ঠিক সেটাই ঘটেছিল। কমিটির সব সুপারিশ সরকার গ্রহণ না করলেও মূল সুপারিশগুলি গ্রহণ করে। জরুরি অবস্থা কার্যকরি থাকার জন্য গোটা দেশে কঠোর নিয়ন্ত্রণমূলক ব্যবস্থা আরোপ করা ছিল। বিরোধী নেতারা সবাই জেলে, ফলে সংসদের উভয় কক্ষে দুই তৃতীয়াংশ গরিষ্ঠতা অর্জন করতে এবং রাজ্য বিধানসভাগুলি থেকে প্রয়োজনীয় সম্মতি যোগাড় করতে কেন্দ্রের কংগ্রেস সরকারের কোন অসুবিধা হয়নি।

সংবিধানের ৪২তম সংশোধনী আইনে মোট ৫৯টি ধারা ছিল। এই আইনের কতগুলি অংশ নিয়ে আপত্তি করার কিছু নেই। যেমন সংবিধানে ৫১এ ধারাটিকে যুক্ত করে ১০টি মৌলিক কর্তব্য যুক্ত করা। সংবিধানের নির্দেশমূলক নীতিতে কতগুলি নতুন বিষয় যুক্ত করা , যেমন প্রাকৃতিক পরিবেশ সংরক্ষণ ও উন্নতির ব্যাপারে সরকার উদ্যোগী হবে; বন ও বন্যপ্রাণী রক্ষণাবেক্ষণের জন্য সরকার চেষ্টা করবে প্রভৃতি। কিন্তু ৪২তম সংশোধনীতে এমন কিছু সংস্থান ছিল যা নিয়ে প্রবল বিতর্ক হয়।

প্রথমত, সংবিধানের প্রস্তাবনায় উল্লিখিত 'সার্বভৌম গণতান্ত্রিক সাধারণতন্ত্র' কথাগুলির সঙ্গে সমাজতান্ত্রিক ও ধর্মনিরপেক্ষ শব্দগুলি যুক্ত করা হয়। ভারতে মিশ্র অর্থনীতি চালু থাকলেও কোনোভাবে তাকে সমাজতান্ত্রিক বলা যায় না। সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র কাঠামো কিংবা অর্থনৈতিক কাঠামো কোনো কিছুই ভারতে ছিল না। তার পরেও প্রস্তাবনায় 'সমাজতন্ত্র' শব্দটির অন্তর্ভুক্তি ছিল সম্পূর্ণভাবে রাজনৈতিক কারণে। জরুরি অবস্থা জারি করার কারণে দেশব্যাপী কংগ্রেস বিশেষত প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর ভাবমূর্তি সেভাবে ধাক্কা খেয়েছিল তার প্রেক্ষাপটে এক প্রগতিশীল ভাবমূর্তি গড়ে তোলার মরিয়া প্রচেষ্টা ছিল এই সংশোধনীর মাধ্যমে। অন্যদিকে সংবিধানে ২৫ নম্বর ধারায় ধর্মনিরপেক্ষতার বৈশিষ্ট্য ইতিমধ্যেই বিদ্যমান। তারপরেও সংবিধানের প্রস্তাবনায় 'ধর্মনিরপেক্ষ' শব্দটিকে যুক্ত করা হয়েছিল জরুরি অবস্থা জারি এবং নাশবন্দির অপপ্রয়োগের পরে নির্দিষ্ট লক্ষ্য নিয়েই। দিল্লির তুর্কমান গেট-সহ বিভিন্ন অঞ্চলে বস্তি উচ্ছেদ করে সরকার ইতিমধ্যেই জনপ্রিয়তা হারিয়েছিল, বিশেষত সংখ্যালঘুদের মধ্যে। সংবিধান সংশোধন করে ধর্মনিরপেক্ষ বলে নিজেদের নতুন করে ঘোষণার মাধ্যমে সেই সমর্থন ফিরে পাওয়ার এক মরিয়া চেষ্টাই দেখা যায় এই সংশোধনী আইনে।

দ্বিতীয়ত, ৪২তম সংশোধনীর মাধ্যমে মৌলিক অধিকারের গুরুত্ব হ্রাস করে নির্দেশমূলক নীতির গুরুত্ব বাড়ানো হয় এই সংশোধনী আইনে। ৪২তম সংশোধনীতে বলা হলো যে নির্দেশমূলক নীতিগুলিকে বাস্তবে রূপায়িত করার জন্য রচিত আইন সাম্যের অধিকার (১৪ নম্বর ধারা) এবং সম্পত্তির অধিকার (৩১ নম্বর ধারা) লঙ্ঘন করলেও সংশ্লিষ্ট আইন অবৈধ বা বাতিল হবে না। গণতান্ত্রিক সমাজ অর্থবহ হয় মানুষের অধিকারের মাধ্যমে। জনগণের উন্নয়নে রাষ্ট্রের ভূমিকা বৃদ্ধি করার নামে মৌলিক অধিকারে হস্তক্ষেপ এক স্বৈরতান্ত্রিক সরকার প্রতিষ্ঠার পথকেই প্রশস্ত করেছিল।

তৃতীয়ত, ৪২তম সংশোধীনতে হাইকোর্টের ক্ষমতা হ্রাস করা হয়। যেমন হাইকোর্ট কোনো কেন্দ্রীয় আইনের বিচার করতে পারবে না। হাইকোর্টের নির্দেশ, আদেশ লেখা জারি করার ক্ষমতাকে সীমাবদ্ধ করা হয়, নতুন আইনে বলা হয় যে রাজ্য আইনের বৈধতা বিচারের ক্ষেত্রে অন্যূন পাঁচজন বিচারপতি উপস্থিত থাকবেন এবং হাইকোর্টের মোট বিচারপতিদের দুই-তৃতীয়াংশের সমর্থন ছাড়া কোনো রাজ্য আইনকে অবৈধ বা বাতিল করা যাবে না। চতুর্থত, লোকসভার কার্যকাল এক বছর বাড়িয়ে দু'বছর করা হয়। পঞ্চমত, অঙ্গরাজ্যের আইনসভা কর্তৃক রচিত কোনো আইনের বৈধতা বিচার করার ক্ষমতা সুপ্রিম কোর্টের হাত থেকে কেড়ে নেওয়া হয়। ষষ্ঠ, নতুন সংশোধনী আইন অনুযায়ী ভারতের কেন্দ্রীয় আইনসভা ও রাজ্য আইনসভার কোনো সদস্যের যোগ্যতা বা নির্বাচন সংক্রান্ত বিরোধের ক্ষেত্রে রাষ্ট্রপতি চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবেন। অর্থাৎ এক্ষেত্রে আদালতের কোন ক্ষমতা থাকবে না।

৪২তম সংবিধান সংশোধনী আইনের মূল লক্ষ্যই ছিল আদালতে ক্ষমতা যতটা সম্ভব কমিয়ে সংসদকে সার্বভৌম ক্ষমতা প্রদান করা। রাজ্য সরকারগুলির উপর হাইকোর্টের নিয়ন্ত্রণ যতটা সম্ভব হ্রাস করা। মৌলিক অধিকারের গুরুত্ব হ্রাস করে নির্দেশমূলক নীতিকে শক্তিশালী করে ব্যক্তিজীবনে রাষ্ট্রের হস্তক্ষেপের পথ প্রশস্ত করা। অর্থাৎ গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থার কাঠামোর মধ্যে এক স্বৈরাচারী ব্যবস্থা চালু করার চেষ্টা ছিল ৪২ তম সংশোধনী আইনে। দেশের স্বার্থে এই সংশোধন আনা হয় নি। আনা হয়েছিল তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর ব্যক্তিগত স্বার্থে এবং কংগ্রেস দলের শাসনকে প্রলম্বিত করার স্বার্থে। তাই ভারতীয় সংবিধানের ইতিহাসে ৪২তম সংশোধন এক বিতর্কিত অধ্যায়ের সূচনা করেছিল একথা নিঃসন্দেহে বলা যায়।

ফঃ ৪

ভারতীয় ডাকটিকিটে সাধারণতন্ত্র দিবস

ড. কল্যাণ চক্রবর্তী

স্বাধীনতার পর থেকে ভারতে প্রকাশিত ডাকটিকিটের বৈচিত্র্য সত্যিই চোখে পড়ার মতো। চোখে পড়ে তার বিশেষ বিশেষ বার্তাগুলিও। এমন একসময় ছিল যখন ছাত্র ও যুবসমাজ নিজের দেশ এবং বিদেশকে জানতে সেই দেশের ডাকটিকিট, ডাক-তথ্য, আবরণী-খাম, ডাক বুলেটিন ইত্যাদির সুলুকসন্ধান করে নিতেন। যেদিন থেকে ভারতে সাধারণতন্ত্র দিবস পালিত হচ্ছে (১৯৫০ সালের ২৬ জানুয়ারি), তাকে উপলক্ষ্য করে ভারতীয় ডাকবিভাগ মোট ছয়টি ডাকটিকিট প্রকাশ করেছে।

১৯৫০ সালে এইদিনে যে চারটি ডাকটিকিট প্রকাশিত হয়েছিল সুনির্দিষ্টভাবে সেগুলির বিষয় ছিল এইরকম— ১. প্রজাতন্ত্র দিবসে আনন্দিত জনতা (Rejoicing crowd), টিকিটের মূল্যবান দুই আনা। ২. কলম, দোয়াত এবং শ্লোক (Quill, Inkwell and verse), টিকিটের মূল্যমান সাড়ে তিন আনা। ৩. শস্য এবং লাঙ্গল (Corn and Plough), তাতে ভুট্টার শিসের ছবি প্রতীয়মান। টিকিটের মূল্যমান চার আনা। ৪. চরকা এবং বস্ত্র (Charakha and Cloth, Spinning Wheel)। টিকিটের মূল্যমান বারো আনা। অর্থাৎ চারটি ডাকটিকিটের সমন্বিত বার্তাটি হচ্ছে ভারতবাসীর জন্য অন্নবস্ত্রের জোগান দেওয়ার শপথ ভারত গ্রহণ করছে, শপথ নিচ্ছে শিক্ষার অধিকার দানের এবং সবমিলিয়ে দেশবাসীর মধ্যে এক আনন্দের বাতাবরণ তৈরিই স্বাধীনতা-পরবর্তী প্রজাতন্ত্রী ভারতবর্ষের মূল লক্ষ্য।

১৯৭৫ সালে সাধারণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার ২৫ বছর পূর্তি উপলক্ষ্যে সে বছর ২৬ জানুয়ারি ২৫ পয়সা মূল্যের একটি স্মারক ডাকটিকিট প্রকাশিত হয়েছিল। শিরোনাম : 25th Anniversary of the Republic. গণরাজ্য প্রতিষ্ঠার পঁচিশ বর্ষপূর্তি— এমনটাই লেখা হয়েছিল। তাতে ভারতীয় সংসদ ভবনের আঁকা ছবি প্রদর্শিত হয়।

২০০০ সালে সাধারণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার পঞ্চাশ বছর পূর্তি উপলক্ষ্যে গণতন্ত্র দিবসের পরদিন (২৭ জানুয়ারি) প্রকাশিত হয় তিন টাকা মূল্যের একটি স্মারক ডাকটিকিট। তাতে ইংরেজিতে লেখা Mahatma Gandhi : Father of the Nation এবং 50 years of the Republic of India (ভারত গণরাজ্য কে ৫০ বর্ষ)। ডাকটিকিটে যে ছবি ব্যবহৃত হয়েছে, তা ভারতের মানচিত্রের একটি আদল। আদলটি লাঠি হাতে একাকী সামনে হেঁটে চলে যাওয়া গান্ধীজীর ছবির একটি রেখাচিত্র। গান্ধীজীকে যেন পিছন দিক থেকে দেখতে পাওয়া যাচ্ছে। গণতন্ত্র দিবস উল্লেখ ব্যতিরেকে বেশ কয়েক বছর ২৬ জানুয়ারির দিন ভারতীয় ডাকবিভাগ বেশ কিছু স্মারক ডাকটিকিট প্রকাশ করে। তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে ১৯৬২ সালের ২৬ জানুয়ারি গ্রামীণ প্রশাসনে পঞ্চায়েতী রাজ প্রতিষ্ঠার বিশেষ টিকিট; মূল্যমান ছিল ১৫ নয়া পয়সা। ডাকটিকিটটি সাদা ও গোলাপি এই দুই মিশ্র রঙের; নীচে গাছের তলায় নারী-পুরুষ গ্রাম পঞ্চায়েতে মিলিত হয়েছে। গাছটি যেন ভারতবর্ষ, গাছের অন্তঃস্থলে ভারতের মানচিত্র এবং পার্লামেন্ট ভবনের ছবি আঁকা।

১৯৭৩ সালের ২৬ জানুয়ারি ছাপা হয়েছিল ভারতীয় স্বাধীনতার ২৫ বছর পূর্তি (১৯৪৭-১৯৭২) উপলক্ষ্যে ১ টাকা ৪৫ পয়সা মূল্যের একটি স্মারক ডাকটিকিট। টিকিটে ইন্ডিয়া গেটের ছবি। সঙ্গে তিনটি দ্রুতগামী যুদ্ধবিমান জাতীয় পতাকার তেরঙ্গা ধুয়ো ছেড়ে এগিয়ে চলছে। অর্থাৎ সামরিক শক্তিতে ভারত যে এগিয়ে চলছে, এই সদর্থক বার্তাটি ডাকটিকিটের মধ্যে দিয়ে প্রতিভাত।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, ১৯৭৩ সালের ২৬ জানুয়ারি প্রকাশিত অপর একটি ডাকটিকিটেও স্বাধীনতার পঁচিশ বছর পূর্তির শিরোনাম দেখতে পাওয়া যায়। তার কেন্দ্রে অশোকচক্র। মূল্যমান ২০ পয়সা। ১৯৬৬ সালের ২৬ জানুয়ারি ছাপা হয়েছিল ১৫ পয়সা মূল্যমানের একটি ডাকটিকিট, শিরোনাম 'জয় জোয়ান'। গণতান্ত্রিক ভারতের এগিয়ে যাওয়ার একটি বার্তা।

বিশ্ব হিন্দু পরিষদের গঙ্গাসাগর তীর্থযাত্রীদের জন্য সেবা শিবির

গঙ্গাসাগর তীর্থযাত্রীদের জন্য বিশ্ব হিন্দু পরিষদের উদ্যোগে কলকাতা আউট্রাম ঘাটে এক সেবা শিবিরের অয়োজন করা হয়। গত ১০ জানুয়ারি সেবা শিবিরের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপিস্থিত ছিলেন রিষড়া প্রেমমন্দির আশ্রমের স্বামী নির্গুণানন্দজী মহারাজ, বিশিষ্ট শিল্পপতি ও সমাজসেবী শিশির বাজোরিয়া, বিশ্ব হিন্দু পরিষদের কেন্দ্রীয় সহ সম্পাদক স্বপন মুখোপাধ্যায়, বিশিষ্ট হিন্দি সাহিত্যিক বংশীধর শর্মা এবং খাগুল বিপ্র সভার মাঙ্গীলাল রাওকা। ওইদিন সকালে শিবিরস্থলে গায়ত্রী পরিবারের সদস্যরা যজ্ঞ সম্পন্ন করেন। অনুষ্ঠানে বিশিষ্ট গায়ক সত্যনারায়ণ তিওয়াড়ী শ্রীরাম বন্দনা পরিবেশন করেন। অনুষ্ঠান সঞ্চালনা করেন বিশ্ব হিন্দু পরিষদের পশ্চিম কলকাতার অধ্যক্ষ মহেন্দ্র কুমার শর্মা এবং

ধন্যবাদ জানান রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের পশ্চিম ভাগ সহ সঙ্ঘচালক মহাবীর বজাজ। শিবিরকে সফল করতে সক্রিয় সহযোগিতা করেন রামগোপাল শৃংঘা, ড. বিজয় হরভজনকা, মুলতানমল পারীক, চম্পালাল পারীক, সত্যনারায়ণ মৌরিজওয়ালা, সূরজ প্রকাশ গুপ্তা, প্রবীণ শর্মা, সজ্জন সিংহল, শরদচন্দ্র মন্ত্রী, বুলাকীদাস মীমাণী, ড. অশোক আগরওয়াল, ঘীসারাম গোয়েল, সুমন তোষনীওয়াল, মানিক পাল, চন্দ্রনাথ দাস প্রমুখ।

মথুরাবাটী বিবেকানন্দ সেবা সমিতির উদ্যোগে সেবাকাজ ও রক্তদান শিবির

স্বামীজীর আবির্ভাব দিবস উপলক্ষ্যে গত ১২ জানুয়ারি হুগলী জেলার মথুরাবাটী বিবেকানন্দ সেবা সমিতির উদ্যোগে সারাদিন ব্যাপী নানা সেবাকাজ ও রক্তাদান

শিবিরের আয়োজন করা হয়। ৪৪ জনের চক্ষু পরীক্ষা করা হয়। ২৮৮ জন ছাত্র-ছাত্রীকে খাতা ও কলম দেওয়া হয়। ১০০ জন গরিব মানুষকে কম্বল দান করা হয়। সমিতি পরিচালিত পাঠদান কেন্দ্রের ৫ জন কৃতী ছাত্র-ছাত্রীকে পুরস্কৃত কর হয়। গ্রামের এক যুবক সাইকেলে কেদারনাথ যাত্রা করেছিলেন, তাকেও সম্মানিত করা হয়। ৫১ জন রক্ত দান করেন। উল্লেখ্য, ৩ দম্পতি রক্ত দান করেন। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় সরকারের প্রাক্তন কৃষি-অর্থনীতি অধিকর্তা কালীশঙ্কর চট্টোপাধ্যায়, রাজ্য সরকারের প্রাক্তন স্বাস্থ্য অধিকর্তা তথা বিশিষ্ট শিশুরোগ বিশেষজ্ঞ ডাঃ শ্যামল চক্রবর্তী এবং বিশিষ্ট বিজ্ঞানী ড. রাসবিহারী ভড়।

শ্রদ্ধার বার্ষিক অনুভবী সম্মেলন

বীরভূম জেলার বিশিষ্ট সামাজিক সংস্থা শ্রদ্ধার ত্রয়োদশ বার্ষিক অনুভবী সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় সিউড়ী অরবিন্দপল্লী সরস্বতী শিশুমন্দিরে। প্রদীপ প্রজ্বলন করে সম্মেলনের শুভারম্ভ করেন সিউড়ী ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের স্বামী বরদানন্দ মহারাজ, অবসরপ্রাপ্ত জেনারেল ম্যানেজার পুলক সিনহা, শ্রদ্ধার সভাপতি মহাদেব মুখোপাধ্যায়, সম্পাদক দামোদর ঘোষাল। নিরঞ্জন হালদার সহ অন্যদের ভারতমাতা, ওঙ্কার ও স্বামী বিবেকানন্দের প্রতিকৃতিতে পুষ্পার্ঘ্য প্রদানের পর সংগীত পরিবেশন করেন অসীমা মুখোপাধ্যায়, সুব্রত নন্দন, প্রতিভা চট্টোপাধ্যায় ও রতন কাহার। আবৃত্তি করেন মিলন চট্টোপাধ্যায়, মৃণাল চক্রবর্তী, পাপিয়া ও প্রিয়াঙ্কা চক্রবর্তী। উপস্থিত ছিলেন অবসরপ্রাপ্ত জেলা জজ

বিপিন মুখোপাধ্যায়, শিক্ষক অপরেশ বন্দ্যোপাদ্যায়, অনিরুদ্ধ ব্যানার্জী, সঞ্জয় কুমার সিংহ, অধ্যাপক চৈতালী মিশ্র-সহ শতাধিক অনুভবী। আলোচনা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান শেষে হয় রাষ্ট্রবন্দনা।

With Best Compliments from :

PAHARPUR COOLING TOWERS LTD.

PAHARPUR HOUSE

8/1/B, Diamond Harbour Road

Kolkata - 700 027, India

www.paharpur.com

CIN : U02005WB1949PLC018363

Ph. +91-33-4013 3000

Dir. +91-33-4013 3403

Fax : +91-33-4013 3499

vswarup@paharpur.com

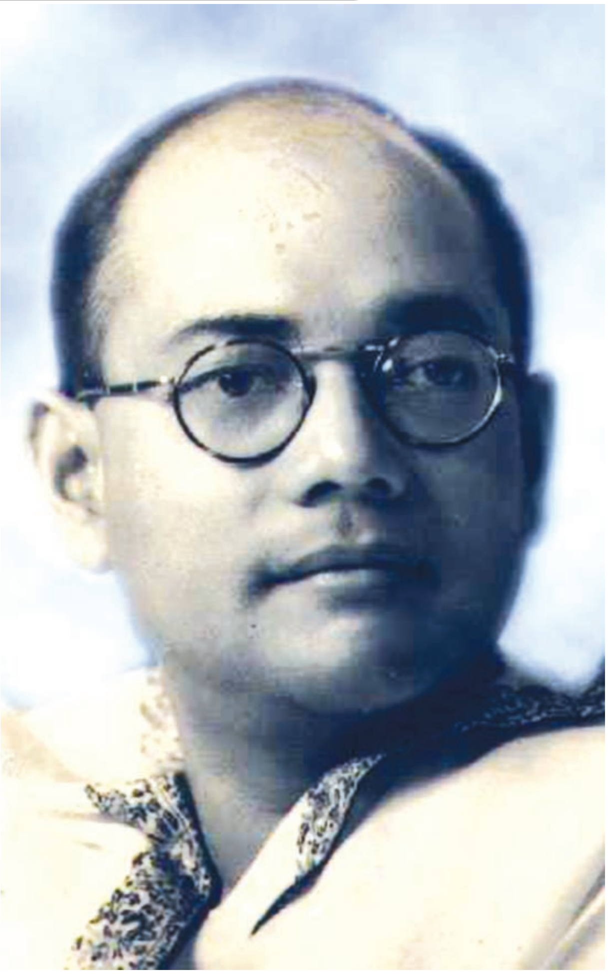

সুভাষচন্দ্র এবং বাঙ্গালির মনস্তত্ত্ব

অমিত দাশ

সচরাচর ক্ষীণবল অখ্যাত বাঙ্গালির বীরবত্তার প্রতি যুগসঞ্চিত স্বপ্ন সাকার হয়েছিল যে মানুষটির 'জীবন-মৃত্যু পায়ের ভৃত্য' পণ করা বীর্যবত্তায়, তিনি যে সুভাষচন্দ্র বসু ভিন্ন অন্য কেউ হতেই পারেন না, সে কথা বলাবাহুল্য।

শৌর্য-বীর্য-মহত্ত্বের মহিমামণ্ডিত যে স্বপ্ন-পুরুষকে মানুষ চিরকাল সন্ধান করে এসেছে। একজন মর্ত্য-মানুষের জীবনে তা যথার্থ সত্য হয়ে দেখা দিলে; মানুষ যদি তাঁকে দেবত্বে উত্তীর্ণ করবার অবকাশ খুঁজে পেতে চায়; তাহলে তাতে দৈব অনুসন্ধানের দুর্বলতা নয়, প্রকাশ পায় শ্রদ্ধার পরাকাষ্ঠা। সুভাষচন্দ্র বাঙ্গালির কাছে দেবমহিমায় উত্তীর্ণ মানবপুত্র। বাঙালির বাগধারায় 'জ্বলন্ত দেশপ্রেম' শব্দটি বোধহয় তাঁর সম্পর্কেই যথার্থ প্রযোজ্য।

কোনো মর্ত্য-মানুষ যখন দেবত্বে উত্তীর্ণ হন, তখন তাঁর জীবনচর্যা প্রায়শই যুক্তি-তর্ক-সিদ্ধান্তের মানদণ্ডটি বিকল করে দেবে, তাতে আশ্চর্যের কিছু নেই। শুধুমাত্র পৌরাণিক চরিত্র রূপপরিগ্রহ করবার সময়েই এমনটা হওয়া সম্ভব অথবা হয়ে এসেছে সে কথা সত্য নয়। বাঙ্গালির আবেগ সমুদ্রের তরঙ্গশীর্ষে অধিষ্ঠিত সুভাষচন্দ্রের ক্ষেত্রেও তা পরিলক্ষিত। উল্লিখিত কারণেই, তথাকথিত বিমান দুর্ঘটনায় না হোক, বয়সের কারণেই এই মর্ত্য-পৃথিবীতে শারীরিকভাবে সুভাষচন্দ্রের জীবিত থাকা সম্ভব নয় জেনেও এই সেদিন পর্যন্ত 'যে কোনো মুহূর্তে তিনি আবির্ভূত হবেন'—এমন বিশ্বাস বিঘোষিত হয়েছে পত্রপত্রিকায়, শহরের দেওয়াল লিখনে। সুভাষচন্দ্রকে কেউ খুঁজছেন উত্তরবঙ্গের শৌলমারিতে, সন্ধান করেছেন কেউ জওহরলাল নেহেরুর মৃত্যুশিয়রে, আবার কেউ-বা অজ্ঞাতনামা কোনো নির্জনবাসীর মধ্যে খুঁজেছেন তাঁর ছায়া।

সুভাষচন্দ্রের প্রতি শ্রদ্ধা থাকা সত্ত্বেও উল্লিখিত অনুসন্ধানীরা হয়তো অজান্তে তাঁকে এতটাই দুর্বল-চিত্ত নির্ধারণ করে বসেন যে, সুভাষচন্দ্রের মতো দৃঢ়প্রতিজ্ঞ মানুষের পক্ষে নিজের সিদ্ধান্ত নিয়ে দোলাচলতায় ভোগা সম্ভব, এমন ভাবনা প্রতিষ্ঠা পেয়ে বসে।

জীবনকে বাজি রেখে যিনি দুর্গম বিপদসংকুল পথে পাড়ি জমাতে দ্বিধাহীন ছিলেন; শত্রুর টর্পেডোকে তোয়াক্কা না করে সমুদ্রপথে বিশ্বের একপ্রান্ত থেকে অপরপ্রান্তের যাত্রায় অটল থেকেছেন, যদি যথার্থই সিদ্ধান্ত করে থাকতেন যে তিনি অজ্ঞাতবাসে থাকবেন, তাহলে লোকচক্ষুর সামনে এসে বালখিল্যতা প্রদর্শন করবেন সুভাষচন্দ্র হেন মানুষ? আত্মগোপন করে থাকবার দৃঢ় ইচ্ছা সত্ত্বেও মাঝে মাঝে দেখা দিয়ে রহস্য ঘনীভূত করবেন?

আত্মগোপন করে থাকবার প্রয়োজনই-বা কী থাকতে পারে? যুদ্ধ অপরাধীর বিচার এড়াবেন সুভাষ—শাস্তির ভয়ে, ইংরেজের ভয়ে—এমন যুক্তি দিতে গেলে তাঁকে যে স্তরে নামিয়ে আনতে হয়, সে সম্পর্কে আলোচনা নিষ্প্রয়োজন।

অপরদিকে অধ্যাত্ম-সাধনার উদ্দেশ্যেই আত্মগোপন করে থাকবার যুক্তি অসম্ভব নয়। ভারতীয় রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের অনেকের মধ্যেই এমন প্রবণতা দুর্লক্ষ্য ছিল না—শ্রীঅরবিন্দ উজ্জ্বলতম দৃষ্টান্ত। আমরা জানি সুভাষচন্দ্রের মধ্যে উল্লিখিত প্রবণতা ছিল আশৈশব। কিন্তু প্রশ্ন অন্যত্র। উল্লিখিত কঠোর সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবার পরও লুকোচুরি খেলবেন সুভাষচন্দ্র! আসলে, সুভাষচন্দ্রকে মাঝেমাঝেই এখানে-ওখানে দেখবার পিছনে হয়তো কাজ করছে মানুষের অসংবৃত আবেগ এবং প্রিয়জন সম্পর্কে মানুষের চিরকালীন আকুতি---'যেতে নাহি দিব' তা, যা মানবচরিত্রের সঙ্গে আদৌ সঙ্গতিহীন নয়।

তথাকথিত বিমান দুর্ঘটনায় সুভাষচন্দ্রের জীবনাবসান হয়েছে, এর অকাট্য প্রমাণ দিতে পারেননি কেউ। সমগ্র জাতির সঙ্গে সঙ্গে, অজ্ঞাতকারণে পরিবারের একটি ছোটো অংশ ছাড়া সুভাষচন্দ্রের পরিবারের অধিকাংশ সদস্য তথাকথিত বিমান-দুর্ঘটনা বিষয়ে

যারপরনাই সন্দিহান। এ সম্পর্কে সুভাষচন্দ্রের জ্যেষ্ঠভ্রাতা সুরেশচন্দ্র বসু ১৯৬২ খ্রিস্টাব্দের ১১ মে তারিখে তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহেরুকে যে পত্র লিখেছিলেন, সে পত্রের দু'টি মূলের একটি সংরক্ষিত ছিল সুরেশচন্দ্রের জ্যেষ্ঠপুত্র অরবিন্দ বসুর কাছে, যেটি পরবর্তীকালে তিনি বর্তমান লেখককে দেন।

স্বাভাবিকভাবে বহু কারণে বিমান দুর্ঘটনা নিয়ে নানা সন্দেহ দানা বেঁধেছে—বিশেষত সোভিয়েত রাশিয়ায় বিভিন্ন সময়ে যাঁরা ভারতীয় রাষ্ট্রদূত হিসেবে কাজ করেছেন, তাঁদের মধ্যে বিশেষ করে ডঃ সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণন, বিজয়লক্ষ্মী পণ্ডিত প্রমুখের কিছু কিছু ইঙ্গিত ঘনীভূত করেছে নানা সন্দেহ।

সুভাষচন্দ্র সোভিয়েত রাশিয়ায় নজরবন্দি থাকতে পারেন—এমন সন্দেহ নিতান্ত অসম্ভব বলে উড়িয়ে দেওয়া যায় না। এমন সম্ভাবনার পিছনে যদি সত্যতা থাকে তাহলেও সময়ে সময়ে সুভাষচন্দ্রকে যারা দেখেছেন বলে দাবি করেছেন, তাদের দাবি মাঝে মাঝে তবু দেখা পাই, চিরদিন কেন পাই না'—এমনই কাব্য-নিবেদনে পর্যবসিত হয় অথবা নিতান্তই গল্পকথা হয়ে দাঁড়ায়।

উল্লেখ্য, সুভাষচন্দ্রের আই.এন.এ পর্বের সহযোগীদের মধ্যে, বিশেষত শাহনওয়াজ খান এবং লক্ষ্মী সায়গলের পরস্পরবিরোধী নানা মন্তব্যে রহস্য তৈরির প্রবণতা নজর এড়িয়ে যায় না। প্রসঙ্গত, উল্লিখিত জওহরলাল নেহরু ভারতবর্ষের কমিউনিস্টদের খুবই ঘনিষ্ঠ বলে পরিচিত হয়েছেন।

স্বভাবতই, নানা ধরনের রহস্য তৈরির অবকাশে সুভাষচন্দ্রকে নিয়ে মানুষের জল্পনা-কল্পনা লাগামহীন হয়েছে। মানুষ যাঁকে ভালবেসেছেন, শ্রদ্ধা করেছেন, তাঁকে কেন্দ্র করে নানা কাহিনি, তা বেদব্যাস রচিত মহাভারতের চব্বিশ হাজার শ্লোক লক্ষাধিকে পরিণত হবার মতোই তা কালে কালে বৃদ্ধি পেয়েছে।

এই পরিস্থিতিতে সহজেই প্রশ্ন দেখা দিতে পারে যে তা সুভাষচন্দ্রের জীবনের রহস্যই কি তাঁর সম্পর্কে মানুষের আগ্রহকে সীমাহীন করেছে? উত্তরটি নিছক 'হ্যাঁ' বাচক বলা হলে নিতান্ত সরলীকরণ হতে বাধ্য। বস্তুত, সুভাষচন্দ্রকে নিয়ে বাঙ্গালির মনস্তত্ত্বের নাগাল পেতে বিস্তারিত আলোচনা প্রয়োজন। নাহলে, কারণসমূহ অধরাই থেকে যাবে বলে মনে হয়।

ভারতবর্ষ ছেড়ে চলে যাবার পূর্বে সুভাষচন্দ্রের ছাত্রজীবন, রাজনৈতিক জীবনের নানা পর্বের আলোচনা একান্তভাবে প্রয়োজন হয়ে পড়ে। উল্লিখিত পর্বে দেশের মানুষের সান্নিধ্যে তাঁর সকল কর্মসূচি ছুঁয়ে গেছে মানুষের আবেগ, মানুষের হৃদয়-মন-প্রাণ, কখনো সীমিত পরিসরে, কখনো-বা বৃহত্তর ক্ষেত্রে। জাতির আত্মমর্যাদার প্রতীক হয়ে উঠেছেন সুভাষ—আপামর বাঙ্গালির, সময়ে সময়ে সকল ভারতবাসীরও।

উপরোক্ত সিদ্ধান্ত প্রতিষ্ঠার জন্য নজিরসমূহের উল্লেখ যে তাৎপর্য নিয়েই স্পষ্ট হোক না কেন, তা কোনো কারণেই অনুক্ত থাকা অনুচিত।

ইতিহাসের সাক্ষ্যকে নানা দৃষ্টিভঙ্গির সাহায্যে ব্যাখ্যা করা সম্ভব, কিন্তু তা এড়িয়ে যাওয়া কোনমতেই একজন বিশ্লেষকের আদর্শ হতে পারে না। কোনো বিষয়ে ভালোলাগা-মন্দলাগা, অসোয়াস্তি বা শ্লাঘা প্রাধান্য পেলে তা নিন্দা বা পূজ্য হয়ে উঠতে পারে, বিচার হতে পারে না। প্রসঙ্গত 'প্রাচ্যসমাজ' প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথের মন্তব্য— ''য়ুরোপে এশিয়ায় প্রধান প্রভেদ এই যে, য়ুরোপে মনুষ্যের একটা গৌরব আছে, এশিয়াতে তাহা নাই। এই হেতু এশিয়ার বড় লোককে মহৎ মানুষ বলে না, একেবারে দেবতা করিয়া বসে..." — যেমন সত্য, অপরদিকে নিন্দাচ্ছলে মানুষকে দানব সাজিয়ে তুলবার নজিরও দুর্লক্ষ্য নয়।

সুভাষচন্দ্রের জীবনেও অন্যথা হয়নি নিন্দা ও প্রশংসার স্রোতধারা। এ সত্যকে স্মরণে রেখেই তরুণ সুভাষচন্দ্রের ছাত্রজীবনে প্রেসিডেন্সি কলেজে ওটেন সাহেবকে কেন্দ্র করে সংঘঠিত ঘটনাটি উল্লেখের দাবি রাখে।

ভারতীয় ছাত্রদের সম্পর্কে অবমাননাকর মন্তব্যের জন্য সুভাষের নেতৃত্বে ছাত্রদের দ্বারা ওটেন সাহেব শারীরিকভাবে নিগৃহীত হয়েছিলেন কিনা সে বিষয়ে বিতর্ক হয়েছে, স্বয়ং ওটেন সাহেব কী প্রতিক্রিয়া জানিয়েছিলেন, তা নিয়েও পরস্পরবিরোধী বহু যুক্তি-তর্ক উত্থাপিত হয়েছে। ঠিক কী হয়েছিল তা নির্ধারিত হোক বা না হোক, জাতির নিন্দার প্রতিবাদ সুভাষ নিশ্চিতভাবেই করেছিলেন। শাস্তির সম্মুখীন, কলেজ থেকে বহিষ্কৃত হয়ে সুভাষ হয়ে উঠেছিলেন জাতির প্রতিবাদের প্রতীক। ছাত্রাবস্থাতেই তাঁকে নিয়ে সমাজের সর্বোচ্চস্তরে ও বিশিষ্ট মানুষদের মধ্যে আলোচনা চলেছে।

স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ 'ছাত্রশাসনতন্ত্র' প্রবন্ধ রচনা করে সুভাষচন্দ্র তথা ছাত্রসমাজের পক্ষে যুক্তি সাজিয়ে বলেছেন—''বাংলাদেশের ছাত্রদের মনস্তত্ত্ব যে বিধাতার একটি খাপছাড়া খেয়াল এ কথা মানি না। ছেলেরা যে বয়সে কলেজে পড়ে সেটা একটা বয়ঃসন্ধির কাল। তখন শাসনের সীমানা হইতে স্বাধীনতার এলাকায় সে প্রথমে পা বাড়াইয়াছে। এই স্বাধীনতা কেবল বাহিরের ব্যবহারগত নহে; মনোরাজ্যেও সে ভাষার খাঁচা ছাড়িয়া ভাবের আকাশে ডানা মেলিতে শুরু করিয়াছে। তার মন প্রশ্ন করিবার, তর্ক করিবার অধিকার প্রথম লাভ করিয়াছে, শরীর-মনের এই বয়ঃসন্ধিকালটিই বেদনা-কাতরতায় ভরা। এই সময়েই অল্পমাত্র অপমান মর্মে গিয়া বিঁধিয়া থাকে এবং আভাসমাত্র প্রীতি জীবনকে সুধাময় করিয়া তোলে।"

প্রেসিডেন্সি কলেজের ঘটনাকে বাঙ্গালির, বরং পরাধীন দেশবাসীর মনস্তত্ত্বের নিরিখে বিচার করলে বোঝা সম্ভব জনজীবনে এর প্রভাব কতটা গভীর ও তাৎপর্যপূর্ণ হতে পারে।

পরাধীন ভারতবাসীর উল্লিখিত মনস্তত্ত্বের সন্ধান করতে গিয়ে সুভাষচন্দ্রের চাইতে মাত্র বছর চারেকের ছোটো সৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের আত্মজীবনী 'যাত্রী' থেকে একটি অংশের উল্লেখ করলে সে সময় ইংরেজ সম্পর্কে দেশবাসীর মনোভাবের এক বিশেষ বৈশিষ্ট্য সহজেই অনুমান করা যায়।

'যাত্রী'তে সৌম্যেন্দ্রনাথ লিখেছেন—''ইংরেজ-বিদ্বেষ মনে থিতিয়ে বসেছে তখন, ইংরেজ দেখলেই মনটা বিষিয়ে উঠত, ন' দশ বছর বয়সের একটি ঘটনা মনে পড়ে। আমার মাস্টারমশাইয়ের সঙ্গে চৌরঙ্গী দিয়ে বেড়াতে যাচ্ছি। এক ইংরেজ ভদ্রলোক আসছিল, ইচ্ছে করে তার গায়ে ধাক্কা দিলাম, সে হাতের ছড়ি তুলে আমাকে

মারতে এল। মাস্টারমশাই তার কাছে কী বললেন বুঝলুম না, বুঝলুম এইটুকু যে ক্ষমা চেয়ে আমাকে মারের হাত থেকে বাঁচালেন।"

পরবর্তীকালে স্বয়ং সৌম্যেন্দ্রনাথ নিজের কাজকে নিছক ছেলেমানুষি বলে স্বীকার করলেও ভারতবাসীর মনস্তত্ত্বের প্রতিফলন ছিল সে ছেলেমানুষি, সে সম্পর্কে কোনো সন্দেহ নেই।

তরুণ সুভাষ বাঙ্গালির মনস্তত্ত্ব-সঞ্জাত চাহিদা পূরণ করলেন ভারতবিরোধী অধ্যাপককে নির্দিষ্ট করে সমুচিত জবাব দিয়ে। বাঙ্গালির অস্মিতা সেদিন সুভাষচন্দ্রের কাজে পরিতৃপ্ত হয়েছিল, সে কথা বলা বাহুল্য।

ব্রাহ্মসমাজের সদস্যদের দ্বারা পরিচালিত সিটি কলেজে সরস্বতী পূজা করবার জন্য ছাত্রদের দাবি সমর্থন করেছিলেন সুভাষচন্দ্র। এ বিষয়ে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে মতভেদ ঘটলেও সুভাষচন্দ্র ছাত্রদের পক্ষেই থেকেছেন, সম্ভবত ধর্মাচারণের স্বাধীনতা থাকা উচিত এই বিশ্বাস থেকেই। রাজনৈতিক কারণও কিছু ছিল না এমন নয়, স্বয়ং সুভাষচন্দ্র পরবর্তীকালে স্বীকার করেছেন রাজনৈতিক বাধ্যবাধকতার কথা।

বিষয়টি এমন এক পর্যায়ে পৌঁছেছিল যে, রবীন্দ্রনাথ প্রকাশ্যে তাঁর বিরক্তি প্রকাশ করেছেন। মূর্তিপূজার প্রতি অনীহা থেকেই রবীন্দ্রনাথ নিজের অবস্থান নির্দিষ্ট করেছেন এমন মনে হয় না, কারণ 'মূর্তি' সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ কিছুকাল পূর্বে ভ্রাতুষ্পুত্রী ইন্দিরাকে যে পত্র লিখেছেন, তাতে অসামান্য এক অনুভব প্রকাশ পেয়েছে। একটু দীর্ঘ হলেও পত্রটি উদ্ধারযোগ্য—

"পরশুদিন সু: (সুরেশ) সঃ (সমাজপতি)-র বাড়ি যাবার সময় দেখছিলুম রাস্তার দু'ধারে প্রায় বড়ো বড়ো বাড়ির দালান মাত্রই দুর্গার দশ-হাত তোলা প্রতিমা তৈরি হচ্ছে এবং আশেপাশের সমস্ত বাড়ির ছেলের দল ভারী চঞ্চল হয়ে উঠেছে, দেখে আমার মনে হলো দেশের ছেলে বুড়ো সকলেই হঠাৎ দিন কতকের মতো ছেলেমানুষ হয়ে উঠে সবাই মিলে একটা বড়ো গোছের পুতুল খেলায় প্রবৃত্ত হয়েছে। ভালো করে ভেবে দেখতে গেলে সমস্ত উচ্চ-অঙ্গের আনন্দ-মাত্রই পুতুল খেলা, অর্থাৎ তাতে কোনো উদ্দেশ্য নেই, লাভ নেই—বাইরে থেকে মনে হয় বৃথা সময় নষ্ট কিন্তু সমস্ত দেশের মনে যাতে করে একটা ভাবের আন্দোলন, একটা বৃহৎ উচ্ছ্বাস এনে দেয়, সে জিনিসটি কখোনই নিষ্ফল ও সামান্য নয়।....

উৎসবের সময় ভাবস্রোত দেশের অধিকাংশ লোকের মন অধিকার করে নেয়, তখন সেটাকে আমরা দূর থেকে শুদ্ধ হৃদয়ে সামান্য পুতুলমাত্র দেখছি সেইটে কল্পনায় মণ্ডিত হয়ে পুতুল আকার ত্যাগ করে; তখন তার মধ্যে এমন একটি বৃহৎ ভাবের এবং প্রাণের সঞ্চার হয় যে, দেশের রসিক অরসিক সকল লোকই তার সেই অমৃতধারায় অভিসিক্ত হয়ে ওঠে। তার পরে আবার পুতুল যখন পুতুল হয়ে আসে তখন সেটাকে জলে ফেলে দেয়।

পৃথিবীর সকল জিনিসই এই পুতুল।...কিন্তু হৃদয়ের ভিতর দিয়ে, কল্পনার ভিতর দিয়ে দেখতে গেলে তাদের দেবতা বলে চেনা যায়... তাদের সীমা পাওয়া যায় না। এই কারণে সমস্ত বাংলাদেশের লোক যাকে উপলক্ষ্য করে আনন্দে ভক্তিতে প্লাবিত হয়ে উঠেছে, তাকে আমি মাটির পুতুল বলে যদি দেখি তবে তাতে কেবল আমারই ভাবের

অভাব প্রকাশ পায়।"

সরস্বতীপূজাকে কেন্দ্র করে উদ্ভূত সমস্যায় ছাত্রসমাজের মধ্যে সুভাষচন্দ্রের জনপ্রিয়তা বৃদ্ধি পেয়েছে—সুভাষচন্দ্রের নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠা পেয়েছে সমাজের বিরাট সংখ্যক মানুষের কাছে।

সর্বভারতীয় স্তরে সুভাষচন্দ্রের নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে গান্ধীর সঙ্গে মতভেদকে উপলক্ষ্য করে। ত্রিপুরী কংগ্রেসে গান্ধীর মনোনীত প্রার্থী সুভাষচন্দ্রের কাছে পরাজিত হলেন—গান্ধীর প্রতিক্রিয়া সমালোচনার যোগ্য হলেও সুভাষচন্দ্রের সংযম ছিল যথার্থই মর্যাদামণ্ডিত।

উল্লেখ্য, ১৯২৭ খ্রিষ্টাব্দে মাদ্রাজ কংগ্রেস পূর্ণ স্বরাজের পক্ষে সুভাষচন্দ্রের উৎসাহ গান্ধীজী কোনো এক অজ্ঞাত কারণে ভালোভাবে গ্রহণ করতে পারেননি। পরের বছর কলকাতায় অনুষ্ঠিত কংগ্রেসে সুভাষচন্দ্রের নেতৃত্বে দলীয় সদস্যদের শৃঙ্খলাপরায়ণতার মতো ইতিবাচক বৈশিষ্ট্যকে গান্ধীজী ব্যঙ্গ করেছেন। প্রতিক্রিয়া জানাবার সময় সুভাষ গান্ধীজীর অমর্যাদা করেননি, কটু হতে দেননি বিষয়টিকে।

লাহোর কংগ্রেসে সুভাষচন্দ্রকে ওয়ার্কিং কমিটি থেকেও বাদ দেবার ব্যবস্থা করে জওহরলাল ও সুভাষচন্দ্রের মাঝখানে দেওয়াল তৈরি করে প্রকারান্তরে জাতীয় আন্দোলনকেই ব্যাহত করেছেন গান্ধীজী।

সর্বক্ষেত্রেই সুভাষের প্রতিক্রিয়া ছিল এত বেশি সংযত যে স্বয়ং রবীন্দ্রনাথও তার প্রশংসা করেছেন।

অসুস্থ সুভাষচন্দ্র ১৯৩৩-এ ইয়োরোপে যাত্রাকালে গান্ধীজী কাছ থেকে একটি পরিচয়পত্র চেয়েছিলেন, যাতে ইউরোপের বিশিষ্ট

With Best

Compliments
From

Punjab Glass Depot

With Best Wishes-

UMAYA

Dry-Fruits & Spices
Umaya.contact@gmail.com
M.: 9831126557

With Best Compliments From :-

Hommage Commercial Private Limited

MEM

M. E. M. INDUSTRIES

AN ISO 9001 : 2015 Company

e-mail : cables@memindustries.com
Poddar Court, Gate no. 4, 2nd floor,
18, Rabindra Sanani,
Kolkata-700 001,
Phone : 22357998, 22352996,
Mob. : 9830120020

OUR RANGE

- Compensating Cables
- High Temperature Cables
- Instrumentation Cables
- Trailing Rubber Cables
- Control & Frls Cables
- Thermocouples & RTD

Also Sole Distributor BELDEN (USA)Cables.

মানুষদের সঙ্গে দেখা করে ভারতবর্ষ সম্পর্কে তাঁদের অবহিত করতে পারেন, ভারতীয়দের প্রতি ইংরেজ সরকারের অন্যায়ের প্রতিকার করবার জন্য বিশ্বজনমত তৈরি করাও ছিল সুভাষচন্দ্রের অন্যতম উদ্দেশ্য। গান্ধীজী পরিচয়পত্র দিতে অস্বীকার করেন—সুভাষচন্দ্রের প্রতি গান্ধীজীর বিরাগ ছিল এতটা প্রবল।

গান্ধীবাদী গবেষক ভবানীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় বিষয়টিকে হালকা করার উদ্দেশ্যে লিখেছেন—''গান্ধীজী কেন সুভাষচন্দ্রকে একটি পরিচয়পত্র দিতে রাজি হননি তা অনুমানসাপেক্ষ। পরিচয়পত্রে তিনি কী লিখতেন? সুভাষচন্দ্র দেশপ্রেমিক, তরুণদের নেতা, ত্যাগব্রতে দীক্ষিত, কিন্তু তাঁর মতের বিরোধী, অহিংসার প্রতি পূর্ণ আস্থা তাঁর নেই, স্বাধীনতা সংগ্রামের ভিন্নপন্থায় তিনি অনুসন্ধান করছেন—এই কথা তিনি কি লিখতেন? তা লিখলে পরিচয়পত্রের উদ্দেশ্য কি ব্যর্থ হয়ে যেত না? অথবা লিখতেন, সুভাষচন্দ্র যা নন তাই অর্থাৎ, সুভাষচন্দ্র গান্ধীর নেতৃত্বের অকুণ্ঠ সমর্থক? একথা লেখাও সম্ভব ছিল না।"

ভবানীবাবুর যুক্তি একান্তই অসার। পরিচয়পত্র দেবার সময় পরিচয়পত্র প্রাপকের কী কী মিল তা দেখানো আদৌ আবশ্যক নয়। সুভাষচন্দ্র একজন স্বাধীনতা সংগ্রামী, মাত্র এইটুকু উল্লেখ করেই গান্ধীজী পরিচয়পত্র দিতে পারতেন। হরিপুরা কংগ্রেসে সুভাষচন্দ্রকে আটকানো যাবে না জেনেই গান্ধী সক্রিয়ভাবে তাঁর বিরোধিতা না করলেও সর্দার বল্লভভাই প্যাটেলকে বলেছিলেন—''আমি লক্ষ্য করেছি যে সুভাষচন্দ্র মোটেই নির্ভরযোগ্য নয়।"

ত্রিপুরী কংগ্রেসে প্রত্যক্ষভাবে সুভাষচন্দ্রের বিরোধিতা করেও ব্যর্থ হলে যারপরনাই ক্ষুব্ধ হন গান্ধী। প্রতিক্রিয়া জানাতে গিয়ে রসনাকে হিংসাশ্রয়ী করছেন বললেও অত্যুক্তি হয় না।

সুভাষচন্দ্র সংযমের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করতে পেরেছেন। বাঙ্গালি তো বটেই, ভারতবাসীও আহত হয়েছেন গান্ধী ও অন্যান্য কংগ্রেসিদের আচরণে। সুভাষচন্দ্রের অসামান্য সংযম তাঁর প্রতি মানুষের শ্রদ্ধা ও ভালোবাসাকে বহুগুণ বৃদ্ধি করেছে।

সিভিল সার্ভিস পরীক্ষায় সাফল্যের সঙ্গে উত্তীর্ণ হয়ে সুখে-শান্তিতে নিশ্চিন্তে এক জীবন অতিবাহিত করে কিংবা তৎকালীন অনেক জাতীয় নেতার মতো ব্যক্তিগত সব কিছু সামলে মাঝে মাঝে সভা-সভাবেশে ইংরেজি ভাষায় বাগ্মিতা প্রদর্শন করেও সুভাষচন্দ্র চিরদিন পাদপ্রদীপের সামনে থাকতে পারতেন, কিন্তু কবি যাঁদের সম্পর্কে বলেছেন—'তোমা লাগি নহে মান, নহে ধন, নহে সুখ' —সুভাষচন্দ্র ছিলেন তাঁদেরই অগ্রগামী—অগ্রগণ্য।

একজন রক্তমাংসের মানুষের মতোই সুভাষচন্দ্রের সিদ্ধান্তে কখনো কখনো ভুল থাকা অস্বাভাবিক নয়।

সিভিলিয়ন পরীক্ষায় সফল হয়েও দেশের কাজেই জীবন অতিবাহিত করবার সিদ্ধান্ত নিয়ে দেশে ফিরে সুভাষচন্দ্র-গান্ধী, চিত্তরঞ্জন, রবীন্দ্রনাথ প্রমুখের সঙ্গে দেখা করেন। রবীন্দ্রনাথ তাঁকে এবং তাঁর মতো তরুণদের গঠনমূলক কাজ, গ্রাম পুনর্গঠন, দরিদ্র মানুষদের শিক্ষা-স্বাস্থ্য ইত্যাদি বিষয়ক কিছু কিছু কাজের দায়িত্ব গ্রহণ করবার পরামর্শ দিলেও সেই পরামর্শ গ্রহণ করতে পারেননি সুভাষ। বরং দেশের সন্ধিক্ষণে শুধুমাত্র রাজনৈতিক আন্দোলন, রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডকেই সর্বাপেক্ষ গুরুত্বপূর্ণ মনে হয়েছে তাঁর।

কবির পরামর্শের সুদূরপ্রসারী তাৎপর্য একদিন অনুভব করতে পেরেছিলেন সুভাষ—দ্বিধাহীন ভাষায় নিজের ভুল স্বীকার করেছেন। তাঁর এই স্বীকৃতি নিঃসন্দেহে মহত্ত্বের প্রকাশ।

শুধুমাত্র রবীন্দ্রনাথের পরামর্শ বিষয়ে নিজের বিভ্রম মাত্র নয়, অন্যত্রও যেখানে ভুল হয়েছে নির্দ্বিধায় সর্বসমক্ষে তা স্বীকার করতে সুভাষচন্দ্র কখনো পিছপা হননি। বিপ্লবী সন্তোষ মিত্র বিষয়ক একটি ঘটনা উল্লিখিত মন্তব্যের স্বপক্ষে সাক্ষ্য হিসেবে গৃহীত হবার যোগ্য।

স্বাধীনতা আন্দোলন চলাকালে বিপ্লবী দলসমূহের উপদলীয় দ্বন্দের আলোচনা কিছু পরিমাণে অসোয়াস্তিকর হলেও ইতিহাস নিষ্ঠার কারণেই তা এড়িয়ে যাওয়া চলে না।

রবীন্দ্রনাথ 'চার অধ্যায়' উপন্যাসে বিপ্লবী দলের অন্তর্দ্বন্দ্বের প্রসঙ্গটি উত্থাপন করে তৎকালীন বহু মানুষের ক্ষোভের লক্ষ্য হলেও বাস্তবে তার অন্যথা ইতিহাসে প্রতিষ্ঠা পায়নি। বিপ্লবীদের আত্মকথামূলক রচনাতে কোনো কোনো সময় ভুল ধারণা কীভাবে দ্বন্দ্বকে বৃদ্ধি করেছে, সে কাহিনি বর্ণিত হয়েছে।

বিপ্লবী সন্তোষ মিত্র সম্পর্কে সুভাষচন্দ্রের অনুগামীরা অনেকেই যারপরনাই সন্দিহান ছিলেন। অনেকেই মনে করতেন সন্তোষ মিত্র ইংরেজ পুলিশের চর। স্বয়ং সুভাষচন্দ্রও এ বিষয়ে বিভ্রান্ত হয়েছেন। কিন্তু হিজলি জেলে পুলিশের গুলিতে সন্তোষ মিত্রের মৃত্যু হলে নিজের ভুলের জন্য অনুশোচনাদীর্ণ সুভাষ সন্তোষ মিত্রের বাড়িতে গিয়ে তাঁর মায়ের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করেন। আপাতদৃষ্টিতে একটি সামান্য বিষয় মনে হলেও এর তাৎপর্য যথার্থই মহৎ এবং সুভাষচন্দ্রের বড়ো মনের পরিচয় বহনকারী। এখনকার রাজনীতিতে তো নয়ই, তখনকার দিনেও ওই ধরনের নজির সহজলভ্য ছিল না।

নানাভাবে বঙ্গ তথা ভারতবর্ষের রাজনীতিতে একজন ব্যতিক্রমী চরিত্র হয়ে আত্মমর্যাদা, সহনশীলতা, অস্মিতার প্রতীক সুভাষ সঙ্গত কারণেই মানুষের শ্রদ্ধা ও ভালবাসা আকর্ষণ করে নিতে পেরেছেন। ১৯৪১ সালে স্বাধীনতা অর্জনের লক্ষ্যে সর্বোচ্চ ঝুঁকি নিয়ে যথার্থই বিপদসংকুল পথে পা বাড়িয়ে মানুষের 'নয়নের মণি' হয়ে উঠেছেন সুভাষ। ভারতবর্ষের মাটিতে স্বাধীনতার পতাকা উত্তোলন করে সুভাষচন্দ্র প্রমাণ করেছেন তাঁর দৃঢ়প্রতিজ্ঞ মানসিকতার। বাঙালির আজন্ম ভীতু নাম ঘুচিয়ে দিয়ে জাতিকে মর্যাদার উচ্চশিখরে নিয়ে গেছেন তিনি।

এমন একজন মানুষ যেদিন লোকচক্ষুর অন্তরালে চলে গেলেন সেদিন স্বাভাবিক কারণেই মানুষের ব্যথাতুর হৃদয় অন্তঃপ্রবাহী অশ্রুধারায় সিক্ত হয়েছে। সেই কারণেই পরবর্তীকালে সুভাষচন্দ্র সম্পর্কে নানা কাহিনির কারণেই মানুষ তাঁর সম্পর্কে আগ্রহী হয়েছেন এমন তত্ত্ব যথার্থই অসঙ্গত, মিথ্যারও নামান্তর।

স্বাধীন দেশে সুভাষচন্দ্রকে কাছে না পাবার বেদনা-সঞ্জাত মনস্তাত্ত্বিক প্রতিক্রিয়ায় মানুষ কালপ্রবাহের স্বাভাবিক নিয়ম বিস্মৃত হয়ে প্রতিমুহূর্তে তাঁকে প্রত্যাশা করেছে—এ নিছক এক মোহ-মাত্র হতে পারে না। □

ফঃ ৫

নাগরিকত্ব সংশোধনী আইন লাগু হলে বাঙ্গালি হিন্দুদের জন্য তা হবে কেন্দ্রীয় সরকারের সেরা উপহার

ধর্মানন্দ দেব

ভারতের সংবিধানে 'নাগরিকত্ব'-এর কোনও সুনির্দিষ্ট সংজ্ঞা নেই; কিন্তু সংবিধানের দ্বিতীয় খণ্ডের ৫ থেকে ১১ নম্বর অনুচ্ছেদে কারা নাগরিকত্বের আওতায় পড়বেন, তার কিছু নির্দেশিকা পাওয়া যায়। সংবিধানের অন্য অনুচ্ছেদগুলি ১৯৫০ সালের ২৬ জানুয়ারি কার্যকর হলেও এই অনুচ্ছেদগুলি লাগু হয়ে যায় সংবিধান গ্রহণের লগ্ন থেকেই অর্থাৎ ১৯৪৯ সালের ২৬ নভেম্বর থেকে। সংবিধানের অনুচ্ছেদ ১১ নম্বর অনুসারে নাগরিকত্ব অর্জন, বাতিল এবং আনুষঙ্গিক বিষয়ে আইন প্রণয়নের ক্ষমতা একমাত্র সংসদকে দেওয়া হয়েছে। আর এই ক্ষমতানুসারেই ১৯৫৫ সালে সংসদে প্রণীত হয় নাগরিকত্ব আইন। এই এক আইন যা ১৯৫৫ সালে পাশ হওয়ার পর এখন পর্যন্ত ছয়বার সংশোধিত হয়েছে—১৯৮৬, ১৯৯২, ২০০৩, ২০০৬, ২০১৫ ও ২০১৯ সালে।

২০১৬ সাল থেকে নাগরিকত্ব আইন, ১৯৫৫-এর সংশোধনী হিসাবে Citizenship Amendment Bill (CAB), ২০১৬ ভারতীয় সংসদে উত্থাপিত হয়েছিল। কিন্তু বিরোধিতার জেরে সংসদীয় কমিটির কাছে পুনর্বিবেচনার জন্য পাঠানো হয়। প্রবল বিরোধিতা সত্ত্বেও সামান্য কিছু পরিবর্তনের পর কেন্দ্রীয় ক্যাবিনেট ২০১৯-এর ৪ ডিসেম্বর সপ্তদশ লোকসভায় পুনরায় উত্থাপন করে এবং ৯ ডিসেম্বর নাগরিকত্ব আইন ১৯৫৫-এর সংশোধনী হিসেবে 'Citizenship Amendment Bill (CAB) ২০১৯' লোকসভায় পেশ করেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী অমিত শা। ৭ ঘণ্টা ধরে চলা প্রবল বিতর্কের পর বিলটি ৩১১-৮২ ভোটে লোকসভায় পাশ হয়। দেশময় তীব্র বিরোধিতার মধ্যেও পরিশেষে ২০১৯-এর ১১ই ডিসেম্বর চূড়ান্ত ভোটাভুটিতে ১২৫-৯২ ভোটে নাগরিকত্ব সংশোধনী বিল, ২০১৯ রাজ্যসভাতেও শাসকদল বিজেপি-র সংখ্যাগরিষ্ঠতায় তার প্রধান সহযোগী দল শিবসেনার সহযোগিতা ছাড়াই উত্তীর্ণ হয়। রাষ্ট্রপতির স্বাক্ষর করার পর তা নাগরিকত্ব সংশোধনী আইন, ২০১৯ হিসেবে সংবিধানের অঙ্গ রূপে স্বীকৃতি লাভ করে।

২০১৯ সালে আইন তৈরি করা হলেও, চার বছর অতিক্রান্ত হওয়ার পরেও তা লাগু করা হয়নি। কারণ প্রয়োজনীয় বিধি তৈরি হয়নি আজও। সংসদীয় পদ্ধতির নিয়ম অনুসারে, রাষ্ট্রপতির সম্মতির ৬ মাসের মধ্যে যে কোনও আইনের বিধি তৈরি করতে হয়। যদি এটি না হয়, তাহলে লোকসভা ও রাজ্যসভার অধীনস্থ আইনসভা কমিটিগুলির কাছ থেকে মেয়াদ বাড়াতে হয় প্রয়োজনীয় কারণ দেখিয়ে। সিএএ-র ক্ষেত্রে, ২০২০ সাল থেকে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক বিধি প্রণয়নের জন্য নিয়মিত বিরতিতে সংসদীয় কমিটিগুলির কাছ থেকে এক্সটেনশন নিচ্ছে।

> সংবিধানের সপ্তম তপশিলে তিনটি তালিকা আছে। একটি কেন্দ্রের তালিকা, একটি রাজ্যের তালিকা এবং একটি যৌথ তালিকা। নাগরিকত্ব, বিদেশনীতি, প্রতিরক্ষা, রেলের মতো বিষয়গুলি কেন্দ্রীয় তালিকার অন্তর্গত। তাই, নাগরিকত্ব ইস্যুতে যাবতীয় সিদ্ধান্ত নেওয়ার অধিকার শুধু কেন্দ্রের। রাজ্যের নেই।

সর্বশেষ তথ্য অনুসারে লোকসভার বিধি প্রণয়ন সমিতি ২০২৪ সালের ৯ জানুয়ারি এবং রাজ্যসভার বিধি প্রণয়ন কমিটি ২০২৪ সালের ৩০ মার্চ সময় ঠিক করেছে। এই সময়ের মধ্যে বিধি প্রণয়ন হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে বলে ইঙ্গিত পাওয়া যাচ্ছে।

দুর্ভাগ্যক্রমে এই আইন নিয়ে এক শ্রেণীর মানুষ ধর্মীয় ও রাজনৈতিক কারণে ক্রমাগত বিরোধিতার মাধ্যমে সাধারণ মানুষকে ক্রমাগত বিভ্রান্ত করেই চলেছেন। যথাযথ প্রচার ও সচেতনতার অভাবে কিছু মানুষ ভুল যে বুঝছেন না এমনটাও নয়। কিছু প্রশ্ন সাধারণ মানুষের মনে আসছে এবং সেটাই স্বাভাবিক। চলতি বছরে লোকসভা নির্বাচন। নির্বাচনী দিনক্ষণ ঘোষণা করার আগে নাগরিকত্ব সংশোধনী আইনের প্রয়োজনীয় বিধি কেন্দ্র সরকার জনসমক্ষে আনতে পারে বলে আভাস পাওয়া যাচ্ছে। তাই বিভ্রান্তি দূর করে এই আইনকে নিরপেক্ষ চোখে দেখতে সেসব প্রশ্নের উত্তর খোঁজা সময়ের দাবি।

নাগরিকত্ব সংশোধনী আইন ২০১৯ কী?

১৯৫৫ সালের নাগরিকত্ব আইন অনুসারে যে কোনও ভারতীয় নাগরিককে নাগরিকত্ব প্রদানের জন্য পাঁচ রকমের নিয়ম রয়েছে—জন্ম, বংশগত, প্রাকৃতিককরণ, নিবন্ধকরণ এবং ভারত দ্বারা যে কোনও অঞ্চল অধিগ্রহণ। নাগরিকত্ব আইনে এই সংশোধনী মূলত ন্যাচারালাইজেশন বা প্রাকৃতিককরণ প্রক্রিয়া দ্বারা নাগরিকত্ব প্রদানের জন্য এক প্রকারের সংশোধনী। সহজ কথায় বলতে গেলে যে সব হিন্দু, বৌদ্ধ, শিখ, পার্সি, জৈন বা খ্রিস্টান ২০১৪ সালের ৩১ ডিসেম্বরের আগে পাকিস্তান, বাংলাদেশ বা আফগানিস্তান থেকে ভারতে এসেছেন তাঁরা প্রত্যেকে এখন ভারতের স্বাভাবিক নাগরিক। এরপর ওই

দেশগুলি থেকে যে সকল ধর্মীয় সংখ্যালঘু, অর্থাৎ হিন্দু, বৌদ্ধ, শিখ, পার্সি, জৈন বা খ্রিস্টান ভারতে আসবেন তাঁরা পাঁচ বছর ভারতে থাকলেই স্বাভাবিকভাবে ভারতের নাগরিক হওয়ার যোগ্য। ওই তিন দেশ থেকে যে সকল ধর্মীয় সংখ্যাগুরুরা ভারতে আসবেন তাঁরা আগের মতোই এগারো বছর ভারতে থেকে নাগরিকত্বের আবেদন করতে পারবেন। অসম, মেঘালয়, মণিপুর ও ত্রিপুরার যে সমস্ত উপজাতি অধ্যুষিত জায়গা সংবিধানের ষষ্ঠ তপশিলের অন্তর্গত সেখানে এই আইন প্রযোজ্য হবে না। এছাড়া উত্তর-পূর্ব ভারতের যে সমস্ত রাজ্যে যেতে গেলে ইনার লাইন পারমিট লাগে সেখানেও এই আইন প্রযোজ্য হবে না।

ওই তিন দেশ থেকে আসা হিন্দু, শিখ, জৈন, বৌদ্ধ, পার্সি ও খ্রিস্টানদের কীভাবে সুবিধা হবে CAA থেকে?

প্রথমত,পাসপোর্ট বা ভিসার মতো নথি না থাকলেও ভারতীয় নাগরিকত্বের জন্য আবেদন করা যাবে। CAA-র মাধ্যমে এই শরণার্থীরা এমন সুযোগ পাবেন। দ্বিতীয়ত, ভারতীয় নাগরিকত্বের জন্য তাঁদের আবেদনের রাস্তা আরও মসৃণ হবে। এদেশে বসবাসের ন্যূনতম সময় ১+ ১১ বছরের পরিবর্তে ১ + ৫ বছর হবে। শোনা যাচ্ছে অনলাইন আবেদনের সুযোগ দেওয়া হতে পারে।

পাকিস্তান, বাংলাদেশ ও আফগানিস্তানের মুসলমানরা কখনোই কি ভারতীয় নাগরিকত্ব পাবে না?

না। এমন কোনও লক্ষ্যে CAA গঠন করা হয়নি। বিগত বছরগুলিতে ওই দেশগুলি থেকে শতাধিক মুসলমানকে নাগরিকত্ব দেওয়া হয়েছে। ভবিষ্যতেও যোগ্যতার বিচারে নাগরিকত্ব পাবেন তারা। ধর্মের বিচারে নাগরিকত্ব দেওয়া হবে না। ২০১৪ সালে ভারত-বাংলাদেশ ছিটমহল সমাধানের পর ১৪, ৮৬৪ জন বাংলাদেশি নাগরিককে ভারতীয় নাগরকিত্ব দেওয়া হয়েছে। এদের মধ্যে হাজার হাজার মুসলমানও রয়েছেন।

বর্ণ, লিঙ্গ, রাজনৈতিক সংগঠনের সদস্য, ভাষা ইত্যাদির বিচারেও কি আবেদন করা যাবে CAA-র মাধ্যমে?

না। CAA-র বিস্তৃতি অত্যন্ত স্পষ্ট। তিন পড়শি দেশের ছয় সংখ্যালঘু গোষ্ঠীর বিদেশি নাগরিকরাই শুধু এই আবেদন করতে পারবেন। অন্য কোনও দেশের বিদেশি নাগরিক নাগরিকত্ব আইন (১৯৫৫) অনুযায়ী ন্যূনতম শর্ত পূরণের মাধ্যমে ভারতীয় নাগরিকত্বের জন্য আবেদন করতে পারবেন।

সিএএতে ৩১ ডিসেম্বর ২০১৪ তারিখ উল্লেখ থাকার কারণ কী?

নতুন নাগরিকত্ব আইন অনুযায়ী ওই তিন দেশের সংখ্যালঘু যারা ভারতে এসে কমপক্ষে পাঁচ বছর আছেন তারাই ভারতের নাগরিক হবেন। তাই পাঁচ বছর আগের ডিসেম্বরের শেষ দিনটিকে বেছে নেওয়া হয়েছে যাতে এক লহমায় বর্তমানে ভারতে থাকা সমস্ত হিন্দু, শিখ, বৌদ্ধ, জৈন, পার্সি বা খ্রিস্টান নাগরিককে নাগরিকত্ব দেওয়া যায়।

ধর্মীয়ভাবে অত্যাচারিত হবার প্রমাণ কোথা থেকে পাওয়া যাবে?

এখনও পর্যন্ত যা শোনা যাচ্ছে তাতে ওই তিন দেশে ধর্মীয় বা সংস্কৃতিগত নির্যাতিত হবার কোনো প্রমাণ নাগরিকত্বের আবেদন করার সময় দিতে হবে না। শুধুমাত্র একটি ঘোষণাপত্র থাকবে যেখানে আবেদনকারীকে ঘোষণা করতে হবে তিনি ওই তিন দেশের সংখ্যালঘু এবং ধর্মীয়ভাবে নির্যাতিত। নির্যাতনের কোনো প্রমাণ চাওয়ার কোনো প্রশ্ন নেই। সরকার জানে এরকম কোনো প্রমাণ চাওয়া অনৈতিক ও অমানবিক। এই সংক্রান্ত বিস্তারিত নির্দেশিকা বিধি প্রণয়ন হওয়ার পর জানা যাবে। মোদ্দা কথা হলো, কাগজ দেখানো সংক্রান্ত যেসব কথা বলে মানুষকে আতঙ্কিত ও বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করা হচ্ছে তা সর্বৈব মিথ্যা। ধর্মীয়ভাবে নির্যাতিত হবার বা ওই তিন দেশে সংখ্যালঘু হবার কোনো প্রমাণ কোনোদিন চাইবে না বলেই মনে হয়।

নতুন আইনে দেশেরই কিছু জায়গাকে বাদ দেওয়ার কারণ কী? ওই জায়গায় যারা থাকেন তারা কি নাগরিকত্ব পাবার যোগ্য নন?

অসম, মেঘালয়, মণিপুর ও ত্রিপুরার যে সমস্ত জায়গা ষষ্ঠ তপশিলের অন্তর্গত এবং ভারতের যেসব জায়গায় যেতে ইনার লাইন পারমিট লাগে সেইসব স্থানকে এই আইনের বাইরে রাখা হয়েছে মূলত সেখানকার স্বকীয়তা ও সংস্কৃতিকে ধরে রাখার জন্য। এই সব এলাকায় যারা থাকেন তারা দেশের অন্য যে কোন জায়গা থেকে নাগরিকত্বের আবেদন করলে নাগরিকত্ব সমেত সব ধরনের নাগরিক সুবিধা পাবেন।

শরণার্থীদের জন্য প্রয়োজনীয় আইন আগে আনা সম্ভব হয়নি কেন?

শরণার্থীদের নিয়ে বিল এই প্রথমবার ভারতে পাশ হলো, এটা সত্যি নয়। এর আগে ১৯৫০ সালে যখন জওহরলাল নেহরু প্রধানমন্ত্রী ছিলেন আর ডঃ বি আর আম্বেদকর ছিলেন আইনমন্ত্রী তখন মন্ত্রীসভা শরণার্থী আইন ১৯৫০ বিষয়ে সম্মতি দেয়। সেখানে বলা হয়েছিল অসম দিয়ে ভারতে আসা সমস্ত অবৈধ অনুপ্রবেশকারীকে বের করে দেওয়া হবে। কিন্তু যারা, বিশেষত হিন্দু ও শিখ, নির্যাতনের শিকার হয়ে ভারতে আসছেন তাদেরকে ভারতে থাকার জায়গা দেওয়া হবে। যদিও এই আইন যথাযথ পালন করা হয়নি। এরপর ২০০৩ সালে যখন অটলবিহারী বাজপেয়ী ছিলেন ভারতের প্রধানমন্ত্রী তখন সরকার সিদ্ধান্ত নেয় রাজস্থান ও গুজরাট সরকারকে বিশেষ ক্ষমতা দেওয়ার ব্যাপারে যেখানে রাজ্য সরকার হিন্দু ও শিখ শরণার্থীদের নাগরিকত্ব দিতে চাইলে দিতে পারবে। বাস্তব কথা হলো, শরণার্থীদের সমস্যা ভারতের যে তিনটে রাজ্যে সব থেকে বেশি তাদের একটা পঞ্জাব এবং অন্য দুটি রাজ্য হচ্ছে পশ্চিমবঙ্গ ও অসম। তাই ভারতব্যাপী একটা যথাপোযুক্ত আইন আনার দরকার ছিল।

পরিশেষে বলা যায়, বিধি প্রণয়ন হয়ে গেলে নাগরিকত্ব আইনের এই সংশোধনী হবে স্বাধীনতার পর হিন্দু বাঙ্গালীদের প্রতি কেন্দ্রীয় সরকারের সেরা উপহার। সংবিধানের সপ্তম তপশিলে তিনটি তালিকা আছে। একটি কেন্দ্রের তালিকা, একটি রাজ্যের তালিকা এবং একটি যৌথ তালিকা। নাগরিকত্ব, বিদেশনীতি, প্রতিরক্ষা, রেলের মতো বিষয়গুলি কেন্দ্রীয় তালিকার অন্তর্গত। তাই, নাগরিকত্ব ইস্যুতে যাবতীয় সিদ্ধান্ত নেওয়ার অধিকার শুধু কেন্দ্রের। রাজ্যের নেই। কেন্দ্র চাইলে, রাজ্যও তা মানতে বাধ্য। যদি কোনও রাজ্য আইন না মানতে চায়, সেক্ষেত্রে সেইসব রাজ্যে সাংবিধানিক সংকট তৈরি হতে পারে। তাই সবাইকে নিরপেক্ষ চোখে দেখা দরকার ২০১৯ সালের নাগরিকত্ব আইনের সংশোধনী।

(লেখক বিশিষ্ট আইনজীবী)

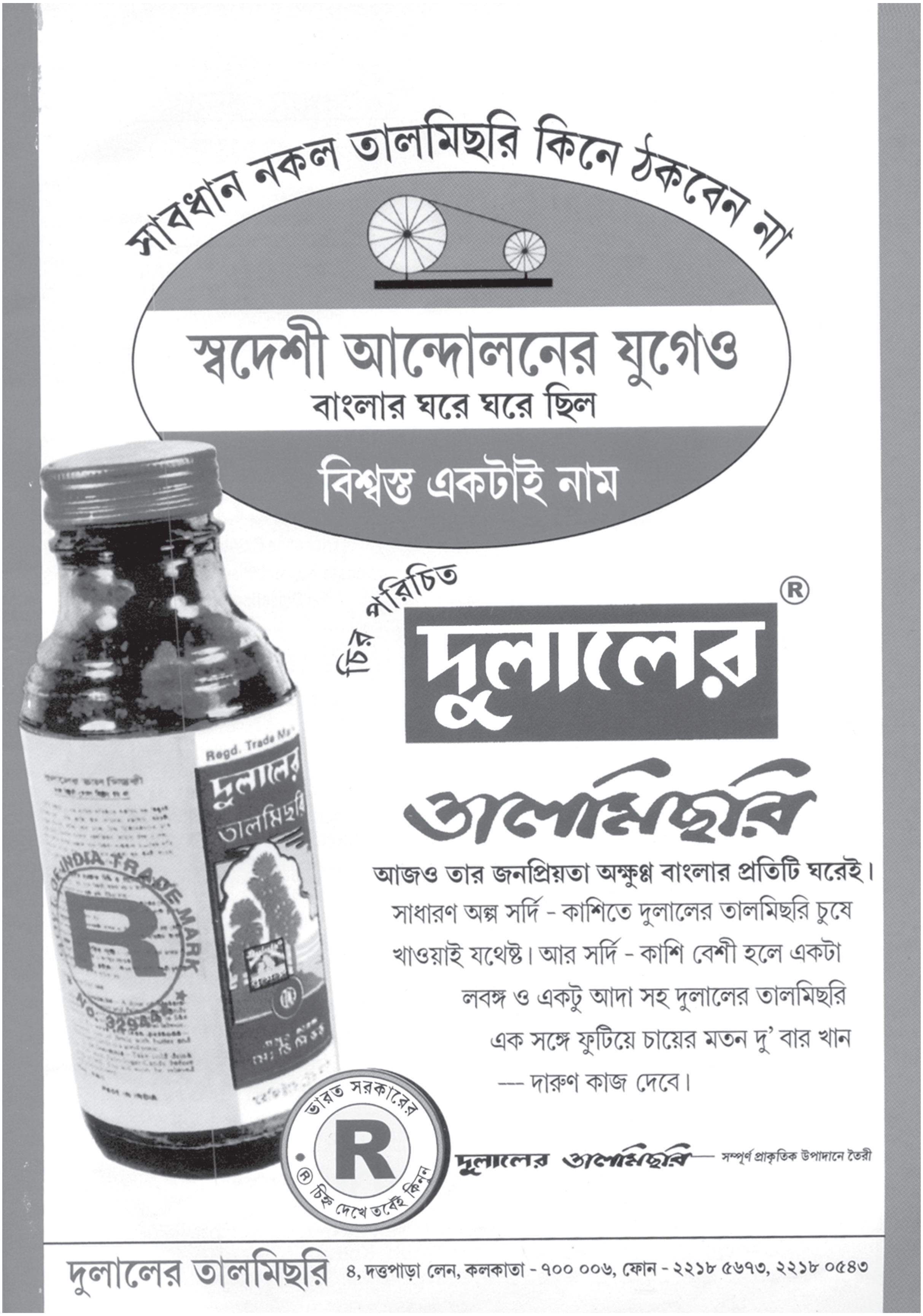
সাবধান নকল তালমিছরি কিনে ঠকবেন না
স্বদেশী আন্দোলনের যুগেও
বাংলার ঘরে ঘরে ছিল
বিশ্বস্ত একটাই নাম
চির পরিচিত
দুলালের ®
তালমিছরি
আজও তার জনপ্রিয়তা অক্ষুণ্ণ বাংলার প্রতিটি ঘরেই।
সাধারণ অল্প সর্দি - কাশিতে দুলালের তালমিছরি চুষে
খাওয়াই যথেষ্ট। আর সর্দি - কাশি বেশী হলে একটা
লবঙ্গ ও একটু আদা সহ দুলালের তালমিছরি
এক সঙ্গে ফুটিয়ে চায়ের মতন দু' বার খান
--- দারুণ কাজ দেবে।
Regd. Trade Mark
দুলালের
তালমিছরি
ভারত সরকারের
R
Ⓡ চিহ্ন দেখে তবেই কিনুন
দুলালের তালমিছরি — সম্পূর্ণ প্রাকৃতিক উপাদানে তৈরী
দুলালের তালমিছরি ৪, দত্তপাড়া লেন, কলকাতা - ৭০০ ০০৬, ফোন - ২২১৮ ৫৬৭৩, ২২১৮ ০৫৪৩

এইডস্ সচেতনতার বার্তা দিয়ে পৃথিবী পরিভ্রমণ আন্তর্জাতিক সাইক্লিস্টের

নিজস্ব প্রতিনিধি ॥ 'পতন-অভ্যুদয়- বন্ধুর পন্থা, যুগ-যুগ ধাবিত যাত্রী/ হে চিরসারথি, তব রথচক্রে মুখরিত পথ দিনরাত্রি।'

৭০৯০ দিন ধরে ২ লক্ষ কিলোমিটার পথ সাইকেলে পরিক্রমা করে ২০২৩-এর ৭ ডিসেম্বর ভারতে প্রত্যাবর্তন করলেন আন্তর্জাতিক সাইক্লিস্ট সোমেন দেবনাথ। এইচআইভি ঘটিত এইডস্ রোগ সম্পর্কিত সচেতনতার বার্তা বিশ্বের ১৯১টি দেশে পৌঁছে দিয়ে বাংলাদেশ সীমান্ত হয়ে ভারতে প্রবেশ করেন সুন্দরবনের বাসন্তীর ভূমিপুত্র সোমেন। নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর সংলগ্ন একটি স্থানে তাঁকে বরণ করে নেন তাঁর মা শোভারানি দেবনাথ। দেশের মাটিতে তাঁকে স্বাগত জানানোর এই অনুষ্ঠানে যোগ দেন তাঁর বন্ধু মঙ্গল রায়, শিক্ষক তপন মাইতি, সমাজসেবী প্রশান্ত সরকার ছাড়াও তাঁর আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব ও শুভাকাঙ্ক্ষীরা। এতদিন পর দেশে ফিরে এতজনের সংবর্ধনা পেয়ে সোমেন আপ্লুত ও অভিভূত হয়ে পড়েন।

সুন্দরবনের বাসন্তী ব্লকের সোমেন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাণীবিদ্যায় স্নাতক। তাঁর লক্ষ্য ছিল বিশ্বের প্রতিটি কোণে হিউম্যান ইমিউনো-ডেফিশিয়েন্সি ভাইরাস সম্পর্কে সচেতনতা প্রচার। এই ভাইরাসের দ্বারা সংক্রামিত ব্যধি অ্যাকোয়ার্ড-ইমিউনো ডেফিশিয়েন্সি সিন্ড্রোমের (এইডস্) বিষয়ে সতর্কতার বার্তা পৌঁছে দেওয়া ছিল তাঁর সংকল্প। এই উদ্দেশ্যে ২০০৪ সালের ২৭ মে সাইকেলে সওয়ারি হয়ে তিনি বিশ্বভ্রমণে বেরিয়ে পড়েন। ২০০৪-২০০৭ পর্যন্ত সময় অতিবাহিত হয় সাইকেলে ভারতীয় উপমহাদেশ পরিভ্রমণে। তারপর ২০০৭ থেকে ২০০৯ সাল— প্রায় ২ বছর ধরে এশিয়া মহাদেশের বহু দেশ সাইকেলে ভ্রমণের পর ২০০৯ থেকে ২০১২ পর্যন্ত গ্রিনল্যান্ড-সহ

ইউরোপের ৫০টি দেশ তিনি সাইকেলে চেপে পৌঁছে যান।

২০১২ থেকে শুরু হয় এক নতুন পর্বের সাইকেল যাত্রা। এই সময় থেকে ২০১৫ পর্যন্ত তিনি আফ্রিকা ও মধ্যপ্রাচ্যের ৫২টি দেশে পৌঁছে যান সোমেন। ২০১৫ সালের পর উত্তর ও দক্ষিণ আমেরিকা যাত্রা করেন সোমেন। পৌঁছে যান তুষারাবৃত সুদূর অ্যান্টার্কটিকায়। ২০২০ পর্যন্ত এই পর্বে ৪২টি দেশে সফর করেন তিনি। করোনা মহামারীকালে চীন ও তাইওয়ানে অতিবাহিত হয়েছে তাঁর দিনগুলি। মহামারী শেষেও অব্যাহত থাকে সোমেনের সাইকেল সফর। ২০২০ থেকে ২০২৩ পর্যন্ত অস্ট্রেলিয়া ও আসিয়ান দেশগুলিতে পৌঁছে যান সোমেন।

এখনও পর্যন্ত ২ লক্ষ কিলোমিটার পথ সাইকেলে অতিক্রম করেছেন সোমেন। আফগানিস্তান, ইজরায়েল, আরব দেশগুলো সমেত মোট ১৯১টি দেশে মারণরোগ এইডস্ ও তার কারণ এইচআইভি নামক সংক্রামক জীবাণু সম্পর্কিত সচেতনতার বার্তা তিনি বহন করেছেন। বিশ্বের পথে ভ্রমণে এই বাঙ্গালি বিশ্বপথিক সম্মুখীন হয়েছেন অসংখ্য বাধাবিঘ্নের। জয় করেছেন অগণিত চ্যালেঞ্জ। ২৪ দিন বন্দি ছিলেন তালিবানদের ডেরায়।

বিদেশ ভ্রমণকালে বিভিন্ন দেশের রাষ্ট্রপ্রধান, দূতাবাস-সহ বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীরা তাঁকে নানা ভাবে সহায়তা করেছেন। তাঁদের প্রতি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছেন সোমেন। সোমেনের জীবনে বড়ো বিপর্যয় নেমে আসে ২০১৭ সালে। তিনি তখন ছিলেন এল সালভাদরে। তাঁর কাছে পৌঁছয় পিতৃবিয়োগের সংবাদ। দুঃখে ভারাক্রান্ত হয় সোমেনের মন। বিমানে চেপে তিন দিনের জন্য বাড়িতে ফিরে আসেন। পিতার শেষকৃত্য সেরে ফের ঝাঁপিয়ে পড়েন এইডস্ সচেতনতার প্রচারে।

দীর্ঘ প্রায় ২০ বছর সাইকেলে বিশ্বভ্রমণকালীন ৩৮টি দেশের রাষ্ট্রপতি, ৭২টি দেশের প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষাৎ হয় সোমেনের। ১৭৫টি দেশে ভারতীয় রাষ্ট্রদূত, হাইকমিশনার-সহ দেশ-বিদেশের কয়েক কোটি মানুষের হৃদয়কে স্পর্শ করেছেন সোমেন। নিরলসভাবে এইডস্ প্রতিরোধী সচতেনতা প্রচারে নদীনালা-সমুদ্র পাড়ি দিতে ৩২ বার সাইকেল-সহ বিমানে এবং ২৮ বার জাহাজে সওয়ারি হয়েছেন সোমেন। দেশ-বিদেশ ভ্রমণকালে তাঁর পা রাখা শততম দেশ ছিল নামিবিয়া। বিশ্ব জুড়ে ২ লক্ষ কিলোমিটার পথ পাড়ি দিয়ে, ১৯১টি দেশে একাদিক্রমে একটি মারণব্যাধি বিরোধী প্রচারে ব্যাপৃত থেকে সোমেন হয়ে উঠেছেন অননুকরণীয়। সাইকেলে বিশ্ব জয় করে এই বঙ্গতনয় সৃষ্টি করেছেন একটি অনন্য বিশ্বরেকর্ড যা নবীন প্রজন্মকে কর্মযোগের আদর্শে চির উদ্বুদ্ধ করবে। □

ড. রাজেন্দ্র প্রসাদের সরলতা

বাবু রাজেন্দ্র প্রসাদ ভারতের প্রথম রাষ্ট্রপতি। ১৮৮৪ সালের ৩ ডিসেম্বর তাঁর জন্ম বিহারের সিওয়ান জেলার জিরাদেই গ্রামে। তাঁর বাবা মহাদেব সহায় ছিলেন সংস্কৃতও ফার্সি ভাষায় পণ্ডিত। মা কমলেশ্বরী দেবী ছিলেন ধর্মপ্রাণা মহিলা। তিনি রাজেন্দ্র প্রসাদকে ছোটোবেলায় রামায়ণ-মহাভারতের গল্প শুনিয়ে ভারতীয় সংস্কৃতিতে সংস্কারিত করেছিলেন। তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অর্থনীতিতে প্রথম বিভাগে এমএ পাশ করেন। পরে আইন নিয়ে পড়াশোনা করার সময় কলকাতা সিটি কলেজে অধ্যাপক হিসেবে কাজ করেন। তারও পরে স্বাধীনতা অন্দোলনে যোগ দিয়ে কংগ্রেসের সঙ্গে যুক্ত হন।

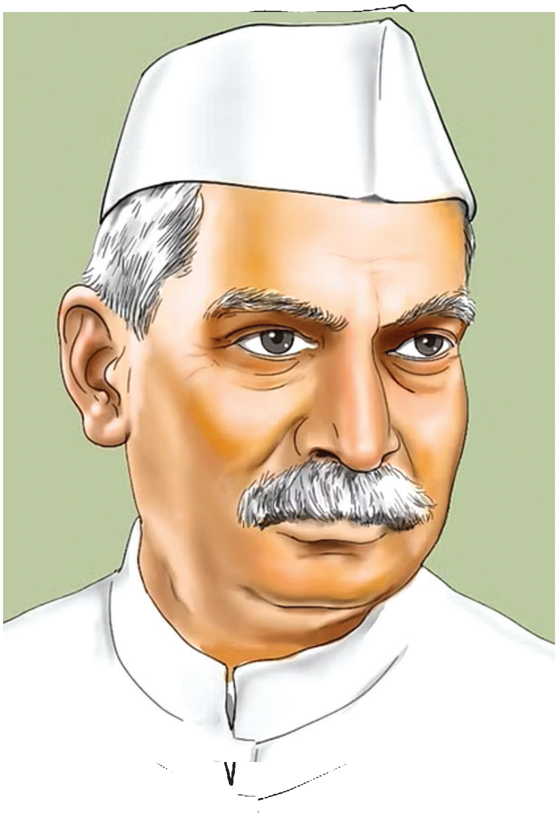

তিনি ভারতের প্রথম রাষ্ট্রপতি হয়েছিলেন। তাঁর সহজ সরল জীবনযাত্রা এবং সাধারণ মানুষের সঙ্গে অতি সাধারণভাবে মেলামেশার কারণে তিনি মানুষের অত্যন্ত প্রিয় হয়ে ওঠেন।

তিনি ১৯৩৫ সালে কংগ্রেসের অধ্যক্ষ নির্বাচিত হয়েছিলেন। সেই সময় তিনি প্রয়াগ থেকে প্রকাশিত ইংরেজি পত্রিকা লিডারের সম্পাদক চিন্তামণি ঘোষের সঙ্গে দেখা করতে তাঁর অফিসে গিয়েছিলেন। অফিসে পৌঁছে চাপরাশির হাতে নিজের পরিচয় সংবলিত স্লিপ দিয়ে বাইরে অপেক্ষা করছিলেন। চাপরাশি সম্পাদকের টেবিলে সেই স্লিপ রেখে দিয়ে দরজার পাশে রাখা টুলে বসেছিলেন।

শীতকাল হলেও সেদিন বৃষ্টি পড়ছিল। সম্পাদকের অফিসে আসার সময় রাজেন্দ্র প্রসাদ ভিজে গিয়েছিলেন। তিনি যেখানে বসেছিলেন তার কাছেই কয়েকজন মজদুর আগুন জ্বালিয়ে হাত-পা সেঁকছিল। রাজেন্দ্র প্রসাদ সেখানে গিয়ে তাদের সঙ্গে দেশোয়ালি ভায়ায় কথা বলতে শুরু করলেন আর সেই ফাঁকে নিজের ভিজে যাওয়া কাপড় শুকোতে লাগলেন।

এদিকে চিন্তামণি ঘোষের হঠাৎ নজর পড়ল টেবিলে রাখা স্লিপের দিকে। তিনি হাতে নিয়ে দেখেই ঘাবড়ে গেলেন। তিনি প্রায় দৌড়ে বাইরে এতে রাজেন্দ্র প্রসাদকে খুঁজতে লাগলেন। তারপরই নজর পড়ল মজদুরদের সঙ্গে তাঁকে আগুন পোহাতে। চিন্তামণি ঘোষ তাঁর কাছে এসে হাত জোড় করে বলতে লাগলেন, ক্ষমা করবেন, আমি আপনার স্লিপটা দেখতে পাইনি, আপানার অনেক দেরি করে ফেললাম ইত্যাদি।

রাজেন্দ্র প্রসাদ হাসতে হাসতে বললেন, আরে, ক্ষমার কোনো ব্যাপার নেই। এই ফাঁকে আমি আমার ভিজে যাওয়া কাপড় শুকিয়ে নিলাম।

চিন্তামণি ঘোষ কংগ্রেসের সর্বভারতীয় অধ্যক্ষের সরলতা দেখে অবাক হয়ে গেলেন।

রাজেন্দ্র প্রসাদ ১৯৫০ থেকে ১৯৬২ — এই বারো বছর রাষ্ট্রপতি ছিলেন। এই বারো বছর রাষ্ট্রপতি ভবনই তাঁর ঘরবাড়ি ছিল। রাষ্ট্রপতি হয়েও তাঁর সরলতার পরিবর্তন হয়নি। তাঁর এক পুরনো চাকর ছিল। নাম ছিল তুলসী। তুলসী একদিন ঘর পরিষ্কার করার সময় টেবিলের উপর থেকে পড়ে হাতির দাঁতের তৈরি কলমটি ভেঙে যায়। কলমটি তাঁকে কেউ উপহার হিসেবে দিয়েছি লেন। তুলসী আগেও এরকম অনেক জিনিস নষ্ট করেছে। তিনি প্রচণ্ড রেগে গিয়ে তুলসীকে কাজ থেকে ছাড়িয়ে দিলেন।

সেদিন তিনি অনেক ব্যস্ত ছিলেন। বিদেশি অতিথিদের সঙ্গে বেশ কয়েকটা মিটিং ছিল। কিন্তু ওই ঘটনার জন্য সারাদিন ধরে তাঁর মনটা খচখচ করতে লাগল। তাঁর সবসময় মনে হতে লাগল, তুলসীর প্রতি খুব অন্যায় করা হয়ে গেল। সন্ধ্যায় একটু অবকাশ পেতেই তিনি তুলসীকে ডেকে পাঠালেন। ভয়ে ভয়ে তুলসী তাঁর ঘরে আসতেই তিনি দৌড়ে গিয়ে তার হাত ধরে ভারী গলায় বললেন, তুলসী আমাকে ক্ষমা করো। আমার খুব অন্যায় হয়ে গেছে। তুলসী ঘাবড়ে গিয়ে কিছু বলতেই পারছিল না। তিনি আবার বললেন, তুমি কি আমাকে ক্ষমা করবে না?

এবার প্রভু ও ভৃত্য দুজনেরই চোখে জল।

নিলাদ্রি

বীর বনবাসী

লক্ষ্মণ নায়ক

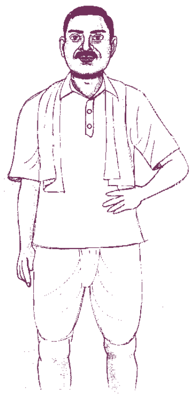

জনজাতি স্বাধীনতা সংগ্রামী লক্ষ্মণ নায়কের জন্ম ১৮৯৯ সালের ২২ নভেম্বর ওড়িশার কোরাপুট জেলার টেন্টুলীগুমা গ্রামে। তিনি ভূমিয়া সমাজের মানুষ ছিলেন। ওড়িশার ভূমিয়া জনজাতি সমাজের মানুষের মধ্যে স্বাধীনতার স্পৃহা জাগরণে তাঁর ভূমিকা ছিল উল্লেখযোগ্য। ব্রিটিশ শাসক জনজাতিদের থেকে জঙ্গলের অধিকার ছিনিয়ে নিলে তিনি মুক্তিবাহিনী গঠন করে ইংরেজের বিরুদ্ধে প্রত্যক্ষ যুদ্ধ ঘোষণা করেন। তাঁর সাংগঠনিক শক্তির পরিচয় পেয়ে ব্রিটিশ সন্ধির প্রস্তাব দেয়। তাঁর সংগঠন দক্ষতার কথা শুনে স্বয়ং গান্ধীজীও তার সঙ্গে দেখা করেন। তাপর তিনি ১৯৪২ সালের আগস্ট আন্দোলনেও অংশগ্রহণ করেন। তাঁর শান্তিপূর্ণ সত্যাগ্রহে ব্রিটিশ পুলিশ গুলি চালালে বহু সত্যাগ্রহী আহত হন। ব্রিটিশ সরকার তাঁর প্রভাবে ভীত হয়ে তাঁর নামে মিথ্যা মামলা করে তাঁকে গ্রেপ্তার করে ১৯৪৩ সালের ২৯ মার্চ ফাঁসির আদেশ দেয়।

এসো সংস্কৃত শিখি-৭

(স্ত্রীলিঙ্গে)

এষা কা— এ কে?

এষা বালিকা— এ বালিকা।

এষা কা? — এষা নায়িকা।

এষা —? — এষা যুবতী।

—কা? —এষা সুন্দরী।

— —? এষা গৃহিণী।

— —? — সুদেষ্ণা।

অভ্যাস করি ঃ

এষা দিব্যা, প্রিয়া, আরাধ্যা, কামিনী, চন্দনা, গৌরী, গায়িকা, সেবিকা, পাচিকা, পরিচারিকা, দেবী, নর্তকী, জননী, পিঙ্কি, ডলি, শর্মিষ্ঠা, ঝুমা।

ভালো কথা

হনুমানের শীত

আমাদের গ্রামে অনেক হনুমান থাকে। কিন্তু কারও কোনো ক্ষতি করে না। এখন পর্যন্ত কাউকেও কামড়ানি। সকালে জলখাবারের সময় প্রতিদিন দু'একটা আসে। বাসি রুটি দিলে সেটা নিয়ে চলে যায়। সবার বাড়িতেই যায়। সবাই কিছু না কিছু দেয়। গত দুদিন থেকে জাঁকিয়ে শীত পড়েছে। সন্ধ্যায় আমাদের বড়ো আমগাছটায় বসে ওরা খুব কাঁপছিল। রাতে আমরা যখন খেতে বসেছি তখন কুড়িটা মতো হনুমান আমাদের উঠোনে নেমে হুপ হুপ শব্দ করে কী যেন বলছিল। আর খুব কাঁপছিল। বাবা দু'তিনটা বস্তা ওদের গায়ে ফেলে দিতেই ওরা ওটা টেনে নিয়ে গিয়ে উঠোনের এক কোনায় যেখানে খড় রাখা ছিল তার উপরে বসে বস্তায় ঢেকে পড়ল। পরদিন সকালে দেখি ওরা বস্তা দিয়ে ঢেকে ঘুমিয়ে আছে। রোদ উঠলে ওরা চলে গেল।

শেফালী মাহাত, সপ্তম শ্রেণী, ভবানীপুর, পুরুলিয়া।

তোমার দেখা বা তোমার সঙ্গে ঘটা এরকম ভালো কোনো ঘটনা যদি থেকে থাকে তাহলে চটপট লিখে পাঠাও আমাদের ঠিকানায়।

শব্দের খেলা

লুপ্ত অক্ষরটি জুড়ে শব্দগঠন করতে হবে

(১) ব ঙ্গ র

(২) ভা ন বা

সঠিক ভাবে সাজাতে হবে

(১) বো বি মা মা রু ন

(২) ব ব্যা বা জ্য সা ণি

---

৮ জানুয়ারি সংখ্যার উত্তর

(১) আন্দামান (২) হিমালয়

৮ জানুয়ারি সংখ্যার উত্তর

(১) হারমোনিয়াম (২) হরেকরকম

উত্তরদাতার নাম

(১) শিবাংশী প্রাণিগ্রাহী, ইংলিশ বাজার, মালদা। (২) মৌমিতা দেবনাথ, মিনতা-৪৯।
(৩) শিবম রায়, রায়নগর, ডায়মন্ড হারবার। (৪) দেবরূপা কর্মকার, গড়িয়া, কলকাতা-৮৪।

সঠিক উত্তরদাতার নাম পরের সংখ্যায় প্রকাশিত হবে।

উত্তর পাঠাতে হবে এই ঠিকানায়

নবাঙ্কুর বিভাগ
স্বস্তিকা
২৭/১বি, বিধান সরণি
কলকাতা - ৭০০ ০০৬
হোয়াটস্ অ্যাপ - 8420240584

E-mail : swastika5915@gmail.com

ফোন, এস এম এস বা মেল করা যেতে পারে।

(পঞ্চম থেকে দ্বাদশ শ্রেণীর ছাত্র-ছাত্রীরাই উত্তর পাঠাতে পারবে)

যোগ চিকিৎসা

যে কোনো শারীরিক-মানসিক রোগ, মেধা স্মৃতি-বুদ্ধি বৃদ্ধি, পড়াশুনায় উন্নতি— বিশিষ্ট যোগ চিকিৎসক-গবেষক অধ্যাপক দীপেন সেনগুপ্তের তত্ত্বাবধানে সম্পূর্ণ ভারতীয় পদ্ধতিতে মাত্র ৪০০০ টাকায় ভর্তির দিন থেকে ১ বৎসর যোগ চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়েছে। চার বৎসর বয়স থেকে সদস্য/সদস্যা নেওয়া হচ্ছে।

স্বামী সন্তদাস ইনস্টিটিউট অব
কালচার যৌগিক কলেজ

১০১, সাদার্ন অ্যাভিনিউ, কলকাতা-২৯
ফোন : ৯৮৩০৫৯৭৮৮৪
৯০৫১৭২১৪২০

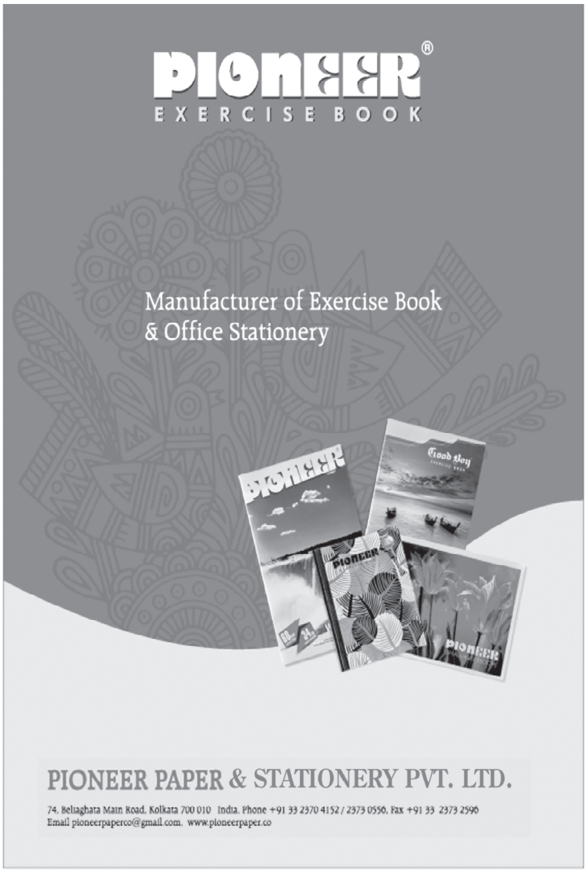

With Best Compliments from -

A
Well wisher

ভারতের সংবিধান এবং ধর্মনিরপেক্ষতা

পৃথা রায়চৌধুরী

বেশ কয়েক শতাব্দী বিদেশি শাসনে থাকার পর ভারতবর্ষ যখন 'India, that is Bharat'-এ রূপান্তরিত হলো, তখন পাশ্চাত্য শিক্ষা ও সংস্কৃতি এদেশের মাটিতে বেশ দৃঢ়মূল হয়ে বসেছে। তাই সংবিধান রচনাকালে অন্যতম মৌলিক অধিকার হিসেবে 'ধর্মীয় স্বাধীনতার অধিকার'-এর উল্লেখ প্রয়োজন হয়ে পড়ে। মূল সংবিধানের তৃতীয় অধ্যায়ে সাতটি মৌলিক অধিকার লিপিবদ্ধ করা হয়েছিল। বর্তমানে যদিও সংবিধান সংশোধনের ফলে ভারতীয় নাগরিক ছয়টি মৌলিক অধিকার ভোগ করতে পারেন। এই ছয়টি মৌলিক অধিকারের মধ্যে কোনো কোনোটি আবার ভারতে বসবাসকারী যে কোনো ব্যক্তি ভোগ করতে পারেন। এর মধ্যে অন্যতম হলো ধর্মীয় স্বাধীনতার অধিকার। ভারতীয় সংবিধানের ২৫ থেকে ২৮নং ধারায় ধর্মীয় স্বাধীনতার অধিকারের কথা লিপিবদ্ধ আছে।

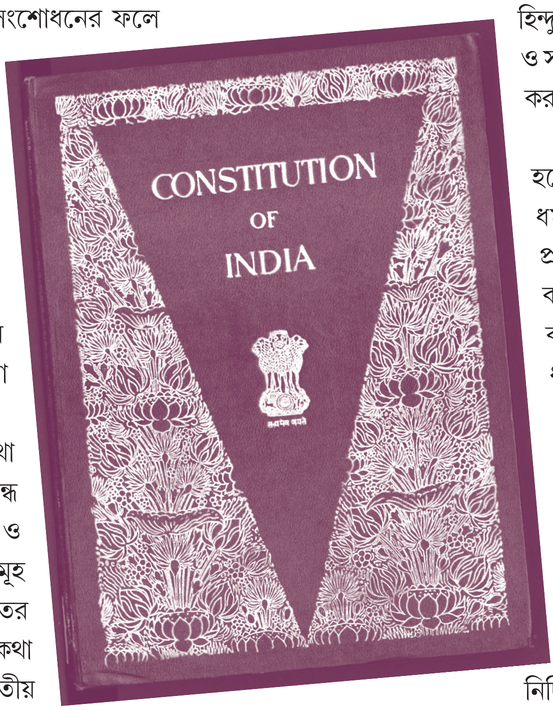

মূল বিষয় প্রবেশ করার আগে একথা উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, বর্তমান প্রবন্ধে প্রচলিত প্রথা অনুযায়ী বহুক্ষেত্রে 'ধর্ম' ও 'ধর্মীয় স্বাধীনতার অধিকার' শব্দবন্ধ সমূহ ব্যবহার করা হলেও প্রকৃতপক্ষে ভারতের সংবিধানে ধর্ম বলতে উপাসনা পদ্ধতির কথা বলা হয়েছে। কারণ ধর্ম বলতে ভারতীয় সংস্কৃতিতে যা বোঝানো হয় তা হলো,

'ধৃতিঃ ক্ষমা দমোঽস্তেয়ং শৌচমিন্দ্রিয়নিগ্রহঃ।
ধীর্বিদ্যা সত্যমক্রোধো দশকং ধর্মলক্ষণম্।।' (মনুস্মৃতি, ৬.৯২)

অর্থাৎ ধৈর্য, ক্ষমা, সংযম, চুরি না করা, ভেতর ও বাইরের পবিত্রতা, ইন্দ্রিয়নিগ্রহ, বুদ্ধি, বিদ্যা, সত্যকথা বলা, ক্রোধ না করা—এই দশটি হলো ধর্মের লক্ষণ। সুতরাং বলা যেতে পারে ভারতের সংবিধানে ধর্ম অর্থে যা বোঝানো হয়েছে তাও একটি পশ্চিমি ধারণা এবং এটি শুধু মাত্র উপাসনা পদ্ধতিকে বুঝিয়েছে। ধর্ম, যার আক্ষরিক অর্থ ধারণ করা, তাকে নয়। যদিও বর্তমান প্রবন্ধে এই 'উপাসনা পদ্ধতি'র পরিবর্তে 'ধর্ম' শব্দটিই ব্যবহার করা হয়েছে।

সংবিধানের ২৫নং ধারায় বিবেকের স্বাধীনতা এবং স্বাধীন ভাবে যে কোনো ধর্ম স্বীকার, আচরণ ও প্রচার করার স্বাধীনতার কথা বলা হয়েছে। আবার ২৫ (২) (ক)-তে বলা হয়েছে, ২৬নং ধারার কোনো কিছুই 'এরূপ কোনো বিদ্যমান বিধির ক্রিয়া প্রভাবিত করবে না অথবা সরকার কর্তৃক এরূপ কোনো বিধি প্রণয়নে অন্তরায় হবে না, যা—

(ক) ধর্মাচরণের সহিত সংশ্লিষ্ট কোনো অর্থনৈতিক, বিত্তগত, রাজনৈতিক বা অন্যপ্রকার ধর্মনিরপেক্ষ কর্মপ্রচেষ্টা নিয়ন্ত্রিত বা সংকুচিত করে।

(খ) সমাজের কল্যাণ ও সংস্কারের, অথবা সার্বজনিক প্রকৃতির হিন্দু ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানসমূহ সর্বশ্রেণীর ও সর্ব বিভাগের হিন্দুদের জন্য উন্মুক্ত করার ব্যবস্থা করে।

সংবিধানের ২৬ নং ধারায় বলা হয়েছে, যে কোনো ধর্ম সম্প্রদায়ের ধর্মীয় এবং দাতব্য উদ্দেশ্যে প্রতিষ্ঠানসমূহ স্থাপন এবং পোষণ করার অধিকার থাকবে। এছাড়াও বলা হয়েছে সব ধর্ম সম্প্রদায়ের ধর্মীয় বিষয়ে নিজ কার্যাবলী পরিচালনা করার, স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তির স্বত্বাধিকারী হওয়ার এবং তা অর্জন করার এবং ওই সম্পত্তি আইন অনুযায়ী পরিচালনা করার অধিকার থাকবে। ২৭নং ধারায় বলা হয়েছে, কোনো ধর্ম সম্প্রদায় বা নির্দিষ্ট কোনো ধর্মের উন্নতির জন্য অথবা তাদের পোষণের ব্যয়নির্বাহের জন্য কোনো ব্যক্তিকে কর দিতে বাধ্য করা যাবে না। আবার সংবিধানের ২৮নং ধারা অনুসারে সরকার পরিচালিত কোনো শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ধর্মীয় শিক্ষা দেওয়া যাবে না। কিন্তু যদি কোনো শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ধর্মীয় শিক্ষা দানের উদ্দেশ্যে দানের অর্থে অথবা কোনো অছি দ্বারা স্থাপিত হয় সেটি সরকার দ্বারা পোষিত হলেও সেখানে ধর্মীয় শিক্ষা দেওয়া যাবে। যদি সরকার পোষিত কোনো শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ধর্মীয় শিক্ষা দেওয়া হয় অথবা উপাসনা করা হয় তবে কোনো ব্যক্তিকে ওই ধর্মীয় শিক্ষা নিতে অথবা ওই উপাসনার সময় উপস্থিত থাকতে বাধ্য করা যাবে না, যদি না ব্যক্তি নিজে অথবা তার অভিভাবক ওই কাজে সম্মতি দেয়।

সংবিধানে ২৫ থেকে ২৮ নং ধারায় যে ধর্মীয় স্বাধীনতার অধিকারের কথা বলা হয়েছে সেখানে মাত্র একবার 'সেকুলার'

ফ ঃ ৬

শব্দটি পাওয়া যায়। পরবর্তীতে ১৯৭৬ সালে ৪২তম সংবিধ্যান সংশোধন আইন দ্বারা সংবিধানের প্রস্তাবনায় 'সেকুলার' শব্দটির অর্থ এবং ব্যাখ্যা নিয়ে বিভিন্ন শিক্ষাবিদ ও সংবিধানবিশেষজ্ঞদের মধ্যে মতপার্থক্য দেখা যায়। 'সেকুলার' শব্দটি সাধারণত দুভাবে ব্যাখ্যা করা হয়ে থাকে। প্রথম ক্ষেত্রে সরকার ধর্ম সম্মন্ধে উদাসীন থাকে। ধর্মের কোনো বিষয়েই সরকার মাথা ঘামায় না। যদিও এমন ক্ষেত্রে রাষ্টের নিজস্ব কোনো ধর্ম থাকতেও পারে। এই ধারণাটি একেবারেই একটি পাশ্চাত্য ধারণা। উদাহরণ হিসেবে গ্রেট ব্রিটেনের কথা বলা যেতে পারে। যেখানে দেশের একটি ধর্ম থাকা সত্ত্বেও দেশ তার নাগরিক অথবা সেদেশে বসবাসকারী অন্যান্য ব্যক্তিবর্গের ব্যক্তিগত ধর্মাচরণের বিষয়ে উদাসীন থাকে। 'সেকুলারিজম্' ধারণাটি প্রকৃতপক্ষে একটি পাশ্চাত্য ধারণা, যা ভারতবর্ষের ঐতিহ্য, সমাজ ও সংস্কৃতির সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়।

ভারতবর্ষের সমাজ ধর্মনির্ভর সমাজ। এই ধর্ম ঈশ্বরবাদী বা নিরীশ্বরবাদী দুইই হতে পারে। 'সেকুলারিজম' নামক পাশ্চাত্য ধারণাটি ভারতবর্ষের সমাজের প্রবেশ করানোর জন্য শিক্ষাবিদরা এর দ্বিতীয় ব্যাখ্যাটি তুলে ধরেছেন। এই দ্বিতীয় মত অনুসারে 'সেকুলারিজম'-এর অন্য একটি অর্থ হলো সব ধর্মকে সরকার দ্বারা সমভাবে সংক্ষণ করা, সমভাবে পোষণ করা। ভারতের সংবিধান বিবৃত ধর্মীয় স্বাধীনতার অধিকার আলোচনা করলে দেখা যায় ভারতের প্রশাসনিক ব্যবস্থা এই দ্বিতীয় মতটিকেই অনুসরণ করার চেষ্টা করেছে, অর্থাৎ সকল ধর্মকে সমভাবে পোষণ করার অঙ্গীকার নিয়েছে।

কিন্তু আবার বিপরীত পক্ষে দেখা গেছে, ভারতের সংবিধানে 'সংখ্যালঘু' নামক শব্দবন্ধের উল্লেখ করে তাদের জন্য বিশেষ পোষণ, বিশেষ ব্যবস্থা এবং বিশেষ পরিষেবার অঙ্গীকার করা হয়েছে। সংবিধানের ২৯ নং এবং ৩০ নং ধারায় এই সংখ্যালঘুদের জন্য বিশেষ ব্যবস্থাসমূহ ভারতীয় নাগরিকদের অন্যতম মৌলিক অধিকার বলে স্বীকৃত হয়েছে। সংবিধানের ২৯নং ধারা অনুসারে ভারতীয় নাগরিকদের, যাদের স্বতন্ত্র ভাষা, লিপি বা সংস্কৃতি আছে, তাদের সেই ভাষা, লিপি বা সংস্কৃতি রক্ষা করার অধিকার আছে। এছাড়াও বলা হয়েছে ধর্ম, বর্ণ, জাতি ও ভাষার ভিত্তিতে ভারতের কোনো নাগরিককে সরকারি বা সরকারি সাহায্যপ্রাপ্ত কোনো শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তি হতে বাধা দেওয়া যাবে না। আবার ৩০নং ধারায় বলা হয়েছে, প্রত্যেক সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের, তা ধর্মভিত্তিক বা ভাষাভিত্তিক যাই হোক না কেন, তাদের নিজেদের পছন্দমতো শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপনের অথবা পরিচালনা করার অধিকার থাকবে। শুধু তাই নয়, ওই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের জন্য সম্পত্তি অর্জন করারও অধিকার থাকবে। সরকার সাহায্য করার ক্ষেত্রে এই সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের স্থাপিত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের প্রতি কোনো বিভেদপূর্ণ আচরণ করতে পারবে না।

আপাতদৃষ্টিতে সংবিধানের এই ধারাগুলি যথেষ্ট প্রয়োজনীয় ও নিরপেক্ষ বলেই মনে হয়। তবে বাস্তবে এই 'সংখ্যালঘু' শব্দবন্ধ এবং তাদের 'মৌলিক অধিকার' ভারতীয় সমাজে যথেষ্ট জটিলতার অবতারণা করেছে। ভারতের সংবিধান সংখ্যালঘুদের জন্য মৌলিক অধিকার নিশ্চিত করেছে, কিন্তু 'সংখ্যালঘু' কারা এবং কেন, সে বিষয়ে পরিষ্কার করে কিছু বলেনি। এক্ষেত্রে ধর্মীয় সংখ্যালঘুর ধারণাটি আরও জটিলতা সৃষ্টি করেছে। সংখ্যালঘু সম্প্রদায় নির্ধারণের দিকগুলি কী কী তাও সংবিধানে কোথাও পরিষ্কার করে বলা হয়নি।

জনসংখ্যার ভিত্তিতে সংখ্যালঘু একটি বিশেষ ধর্ম সম্প্রদায় ভারতে সংখ্যালঘু হিসেবে বিবেচিত হলেও দেখা যায় বিশেষ বিশেষ রাজ্যে তথাকথিত সংখ্যাগুরু সম্প্রদায় সংখ্যায় যথেষ্ট লঘু। কিন্তু মজার বিষয় হলো সেই সব রাজ্যে যারা সংখ্যায় লঘু তারা কিন্তু সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের সংবিধান স্বীকৃত মৌলিক অধিকারগুলি ভোগ করতে পারে না। সেক্ষেত্রে স্বাভাবিক ভাবেই 'সংখ্যালঘু'র ভাষা ও সংস্কৃতি রক্ষা অধিকারটি প্রশ্নের সম্মুখীন হয় এবং 'কৃষ্টি ও শিক্ষা বিষয়ক অধিকার' এই শিরোনামের মৌলিক অধিকারে ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের উল্লেখও কতটা যুক্তিযুক্ত, বিশেষত যেখানে আলাদা 'ধর্মীয় স্বাধীনতার অধিকার'-এর স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে, সে বিষয়েও প্রশ্ন তোলার অবকাশ থেকে যায়। আবার সব ধর্মকে সমান ভাবে পোষণ করার অঙ্গীকার নেওয়ার পরও বিশেষ ধর্মের জন্য বিশেষ সুযোগ সুবিধার ব্যবস্থা করার বিষয়টিও পরস্পর বিরোধী বলেই বোধ হয়।

প্রকৃতপক্ষে ভারতবর্ষে কয়েক শত বছর ব্যাপী শাসকগণ পরিকল্পিত ভাবে এদেশের অধিবাসীদের নিজ শিক্ষা পদ্ধতি, সংস্কৃতিকে ভুলিয়ে বিজাতীয় সংস্কৃতিতে অভ্যস্ত করে তোলার চেষ্টা করে চলেছে। ফলে স্বাধীনোত্তর ভারতের শিক্ষিত সম্প্রদায় আসলে ছিলেন 'মেকলে শিক্ষানীতি'র ফসল। আর এর স্বাক্ষর স্বাধীনোত্তর ভারতের সরকার ব্যবস্থায় প্রস্ফুটিত হয়েছে বারে বারে। 'মেকলে শিক্ষানীতি' আসলে ভারতবর্ষের সমাজ ব্যবস্থাকে অনুধাবন করে, ভারতীয়দের চাহিদার কথা মাথায় রেখে নির্ধারিত হয়নি। এটি নির্মিত হয়েছিল ভারতবর্ষের মাটিতে তৎকালীন ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদী শাসকের সাহায্য তৈরির উদ্দেশ্যে।

স্বাধীনতার পরও দেখা যায় ভারতের সমাজ ও সংস্কৃতির সঙ্গে অসামঞ্জস্যপূর্ণ ধারণাগুলো এদেশের সমাজ এবং সরকার ব্যবস্থায় প্রোথিত করার চেষ্টা চলছে অবিরত। আর তার ফলে ভারতীয় সমাজ এবং রাজনীতিতে জটিলতা দেখা দিয়েছে। আর এই জটিলতায় নিজেদের সমৃদ্ধ করার চেষ্টা করে চলেছে ভারত বিরোধী, স্বার্থান্বেষী গোষ্ঠীসমূহ। আশার কথা, বর্তমানে যুব সমাজের মধ্যে ভারতবর্ষের ঐতিহ্যের প্রতি অনুরাগ বাড়ছে। এই যুব সমাজ যদি ভারতবর্ষের আদি সংস্কৃতিতে অনুপ্রাণিত হয়ে ভারতের নবনির্মাণে ব্রতী হয়, তবেই ভারত আবার বিশ্বগুরুর আসনে অধিষ্ঠিত হতে পারবে। □

রামায়ণের সীতা এবং আজকের সীতা

আত্মনিবেদিত কিন্তু আত্মমর্যাদায় পরিপূর্ণ এক নারীর জীবন, অন্য নারীদের দেয় নতুন আলো। সেই আলোতেই চলার পথ খুঁজে পাবেন আজকের ভারতের নারী।

সুতপা বসাক ভড়

আজকের ভারতীয় নারী নিজ কর্তব্যপালনে সর্বদা তৎপর, দৃপ্ত কিন্তু কখনও-বা বিভ্রান্ত। সর্বস্ব দিয়েও পরিবারের সব সদস্যকে খুশি করতে কখনও কখনও সে অপরাগ। এই অসহায় সর্বনিবেদিত প্রাণীটিকে কেউ বোঝার চেষ্টাটুকু করে না, অথচ পরিবারের প্রত্যেকের চাহিদা প্রধানত এই প্রাণীটিকে কেন্দ্র করেই। বয়োজ্যেষ্ঠরা সেবা চান, সন্তানেরা চায় মায়ের বাৎসল্য এবং স্বামী তার প্রভুত্ব বজায় রাখতে সদা তৎপর। আর মহিলাটির অবস্থা অদ্ভুত। নিজের অস্তিত্বের সন্ধান করতে করতে সে নিজেকে খুঁজে পায় ত্রেতা যুগের সর্বত্যাগী সীতার মধ্যে। নিজেকে বর্তমান যুগে সে সীতার প্রতিভূরূপেই দেখে। এখানেই রামায়ণের সার্থকতা— প্রচণ্ডভাবে বিরাজমান আজকের এই আধুনিক জীবনধারায়। সেজন্য আজকের মহিলারা নিজেদের সঙ্গে সীতাকে অভিন্ন দেখেন। আসুন, একবার ছোটো করে সীতার জীবনকে দেবীরূপে নয়, বরং এক মানবীরূপে দেখি। সত্যিই কি তিনি আমাদের থেকে একেবারে পৃথক— না তাঁর জীবনের নানা বাঁকে আমরা আজকের নারীকেই খুঁজে পাই।

জন্ম থেকেই দেখি যে সীতা স্বতন্ত্র। রাজমহলে তিনি জন্ম নেননি— জন্ম তাঁর ভূমিতে। ধরিত্রীর কন্যা তিনি। তাই ভূমিজা নামেও পরিচিত। রাজাজনক পুত্রীরূপে বরণ করে নেন তাঁকে। রানি সুনয়না ধন্যা হন সীতারূপী কন্যা প্রাপ্তিতে। নিজের মতো করে সাংসারিক ও বিদ্যাদানে তিনি সীতাকে প্রশিক্ষিত করে তোলেন। সীতার বন্ধনকলার কুশলতার প্রমাণস্বরূপ —'সীতা কী রসোই' আজও অযোধ্যায় বিদ্যমান। অপরদিকে, পিতা রাজর্ষি জনক তাঁকে বিদ্যাবুদ্ধি আর জ্ঞানীজন সংসর্গে করে তোলেন বিদুষী। রামায়ণের পৃষ্ঠায় আমরা সীতাকে তৎকালীন মুনি গৃহে অনায়াস বিচরণ করতে দেখি। ঋষি ও ঋষিপত্নীদের থেকে শিক্ষা গ্রহণ তিনি পরিপূর্ণ হয়ে ওঠেন। আশ্রম পরিবেশে থাকাকালীন প্রকৃতির প্রতি এক গভীর টান তিনি অনুভব করেন। তিনি তো ধরিত্রীর কন্যা-— প্রকৃতির অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হিসেবে

With Best Compliments from : -

INDER NAHATA

Rang Rez Sarees (P) Ltd.

Manufacturer of Sarees & Kurti

45/1, Rafi Ahmed Kidwai Road

(Near Park Street Police Station)

2nd floor, Kolkata - 700 016

PHONE : 2265-9147, 94330-15473

An ISO 9001:2008 Company

ACC LOGISTICS

Fleet Owners & Transport Contractors

Registered Government Contractor

40, Girish Park (North),

1st Floor, Suit # 01

Kolkata - 700 006

(Near Calcutta Medicos)

Phone : +91 33 40726528, 40036528 E-mail : ashok@acclogistics.in

URL : www.acclogistics.in

নিজেকে চিনে নিতে তাঁর বিলম্ব হয়নি। নিজেকে যুগানুকূল ও পরিবেশানুকূল করে তোলেন তিনি। আত্মনির্ভর, আত্মবিশ্বাসী এবং আত্মরক্ষায় পারদর্শিনী সীতাকে হরধনু রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব দেন পিতা জনক। এ সেই হরধনু যা দশজন মিলেও ওঠাতে অপারগ তা সীতা অবলীলায় তার স্থানান্তর বা রক্ষাণাবেক্ষণ করতেন।

স্বয়ংবর সভায় শ্রীরামচন্দ্রের আগমন, হরধনু ভঙ্গ এবং সীতার শ্রীরামকে স্বামীরূপে বরণ তো বিধাতা নির্দিষ্ট ছিল। বিবাহোপরান্তে শ্রীরাম লক্ষ্মীস্বরূপা সীতার কাছে নিজেকে 'এক পত্নীত্ব-এর' অঙ্গীকারে আবদ্ধ হলেন। এরপর খুব শীঘ্রই দেখি শ্রীরামের পিতৃসত্য পালনের জন্য সীতা স্বামীর অনুগামিনী। নিজ দায়িত্ব পালনে সদা তৎপর, সেজন্য প্রাসাদের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য ত্যাগ করে অরণ্যগমনে তাঁর বিন্দুমাত্র দ্বিধা ছিল না।

পথিমধ্যে গয়া তীর্থক্ষেত্র। সেখানে স্বর্গত শ্বশুর এবং রঘুকুলের পিতৃগণ কুলবধূ সীতার কাছে আসেন পিণ্ড গ্রহণের জন্য। প্রত্যুৎপন্না সীতা বালি দিয়ে তর্পণ ও পিণ্ডদান করে তাঁদের তৃপ্ত করেন। গভীর অরণ্যে স্বামী শ্রীরাম এবং ভ্রাতৃসম দেবর লক্ষ্মণের দেখাশোনার দায়িত্ব হাসিমুখে তুলে নেন নিজস্কন্ধে।

বনবাসকালে যেখানেই শিক্ষার সুযোগ এসেছে তা গ্রহণ করেছেন। পেয়েছেন ঋষি ও ঋষি পত্নীদের (অনসূয়া, গার্গী) আশীর্বাদ ও শুভকামনা। অরণ্যে থাকাকালীন রঘুকুলের মর্যাদারক্ষার্থে লক্ষ্মণরেখা অতিক্রম করে সন্ন্যাসীরূপী রাবণকে ভিক্ষাদান করেন। দুর্বুদ্ধি রাবণ তাঁকে অপহরণ করলে পুনরায় তিনি উপস্থিত বুদ্ধির পরিচয় দেন। নিজ গাত্র অলংকার ছড়িয়ে স্বামীকে পথনির্দেশ দিলেন। অশোক কাননে তাঁকে বন্দি করে রাখলেন দশানন। কিন্তু নিজের বশে আনতে পারলেন না অসীম শক্তির অধিকারিণীকে। পবননন্দন শ্রীহনুমানের বীরত্বের ওপর সম্পূর্ণ আস্থা সত্ত্বেও অপেক্ষা করেছেন স্বামীর জন্য। যথাসময়ে রঘুনন্দন শ্রীরাম এসে তাঁকে উদ্ধার করেছেন।

তারপর শ্রীরাম নির্দিষ্ট অগ্নিপরীক্ষায় তিনি সসম্মানে উত্তীর্ণ হলেন। চোদ্দ বছর বনবাস যাপন করে সগৌরবে অযোধ্যায় প্রত্যাগমন করলেন এবং শান্তিতে সাংসারিক কাজে আত্মনিবেদন করলেন। শ্বশ্রুমাতাদের সেবা এবং অন্যান্য দায়িত্ব তুলে নিলেন নিজ স্কন্ধে। রঘুকুলবধূ তিনি, কিন্তু এখানেও বিধি বিরূপ। সন্তানসম্ভবা সীতাকে পরিত্যাগ করলেন রামচন্দ্র প্রজার মন রক্ষার্থে।

শ্রীরামের নির্দেশে লক্ষ্মণ সীতাকে অরণ্যে পরিত্যাগ করতে গেলে অনুতপ্ত লক্ষ্মণকে সীতার সান্ত্বনা— তিনি স্বয়ং প্রকৃতির কন্যা। সুতরাং প্রকৃতিতে তিনি সচ্ছন্দ। কেউ তাঁকে বিরক্ত করতে পারবেন না। মর্যাদাপুরুষোত্তম স্বয়ং শ্রীরামচন্দ্রও নন। আবার একাকী অরণ্যবাসকে তিনি মেনে নিয়েছেন— প্রকৃতির কাছে করেছেন আত্মসমর্পণ। এদিকে প্রজাবৎসল শ্রীরামচন্দ্র সীতা বিনে দুঃখী মনে রাজ্যশাসন করছেন। আর সীতা নিজেকে বিস্তার করে প্রকৃতি সঙ্গে একাত্ম হয়ে যাচ্ছেন। সীতার এই রূপ তো আগে দেখিনি! এখন তিনি কেবল স্বামী থেকে দূরে নন বরং প্রকৃতির কন্যা হিসেবে বাল্মীকির আশ্রমে অনায়াসে নিজেকে মানিয়ে নিলেন। এখানে তিনি স্বামীর থেকে অনেক উঁচুতে নিজের স্থান করে নিলেন। যথাসময়ে সন্তানের জন্ম দেন এবং রঘুকুলানুযায়ী তাদের পালনপোষণ করেন। মাতৃচ্ছায়ায় বেড়ে ওঠে লব-কুশ। বাল্মীকির কাছে বিদ্যাশিক্ষা এবং মায়ের কাছে জীবনের শিক্ষাগ্রহণ করে তারা হয়ে ওঠে অপরাজেয়।

অশ্বমেধ যজ্ঞের ঘোড়ার গতি রুদ্ধ করে দু-ভাই। পরিণামস্বরূপ শ্রীরামের সঙ্গে লব-কুশের যুদ্ধ। কিন্তু যুদ্ধ শুরুর ক্ষণেই জানকীর আবির্ভাব, শ্রীরাম যে এ যুদ্ধে তিনি জয়ী হতে পারবেন না। কারণ রঘুবীরের মধ্যে নেই সীতারামের পুত্রদ্বয়কে পরাজিত করার ক্ষমতা। প্রথমে আপন পুত্রদের চিনতে পারেননি রামচন্দ্র। পরে আনন্দের সঙ্গে স্ত্রী-পুত্রদের মিলন এবং সাদর আমন্ত্রণ অযোধ্যায়, কিন্তু আবার অগ্নিপরীক্ষা! সীতা স্বাধীন স্বাভিমানিনী, স্বামী তাঁকে একসময় শ্বাপদসঙ্কুল গভীর জঙ্গলে পরিত্যাগ করেছেন, কখনও সংবাদ নেবার প্রয়োজনটুকু বোধ করেননি। আজ সীতা সেই স্বামীর মুখাপেক্ষী নন, পুত্রদের সমর্পণ করলেন তাঁদের পিতাকে, অযোধ্যার উত্তরাধিকারীদের শিক্ষা, সংস্কার দিয়ে উপযুক্ত করেছেন তিনি। করেছেন আদর্শ মাতার কর্তব্য। তারপর? আবার অগ্নিপরীক্ষা! আর রাজি হলেন না তিনি। লোকসেবায় নিবেদিত প্রজাবৎসল মর্যাদাপুরুষোত্তম শ্রীরামচন্দ্রের জন্য রইল অযোধ্যায় সিংহাসনের পাশে স্বর্ণসীতা। আর জানকী নিজের জন্য বেছে নিলেন চিরবিদায়ের পথ। রামায়ণে দেখি, সীতা জন্মলগ্ন থেকে সব পরিস্থিতিতে নিজেকে মানিয়ে নিয়েছেন। নিজের কর্তব্য পালনে কোনো ত্রুটি কেউ দেখাতে পারেননি, সর্বকল্যাণের জন্য আত্মনিবেদিত সীতার স্থান পঞ্চসতীর তালিকায়। জীবনের কণ্টকময় পথে নিজেকে স্থির, কর্তব্যপরায়ণা রেখেছেন। জীবনের কর্মশেষে নিজের অদৃষ্টকে নিজেই বেছে নিলেন সীতা।

রামায়ণের এই সীতাকে দেখি এক সেবাপরায়ণা, কর্তব্যপরায়ণা স্ত্রী হিসেবে। কিন্তু স্বামী মুখাপেক্ষী নন তিনি। তিনি ঈশ্বরে আশ্রয়ী, আত্মবিশ্বাসী ধরিত্রীর কন্যা। কর্ম সমাপণে মাতৃ-ক্রোড়েই নিলেন চিরবিশ্রাম। মর্যাদাময়ী রাজকন্যা, রাজমহিষীর এই অসামান্য জীবনও আজকের যুগেও অনুপ্রেরণাদায়ী, দেয় সঠিক পথে চলার দিশা।

বর্তমান নারীর জীবন মসৃণ নয়, কণ্টকময় পথে চলতে চলতে কখনও-বা কিংকর্তব্যবিমূঢ় হন তারা। হারিয়ে ফেলেন দিশা, গতি। সেক্ষেত্রে সীতার জীবন তাদের কাছে একমাত্র দিশারি। আত্মনিবেদিত কিন্তু আত্মমর্যাদায় পরিপূর্ণ এক নারীর জীবন, অন্য নারীদের দেয় নতুন আলো। সেই আলোতেই চলার পথ খুঁজে পাবেন আজকের ভারতের নারী। □

পুরুলিয়ায় মকর স্নানযাত্রী তিন জন সাধু প্রহৃত

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ গত ১৩ জানুয়ারি মকর স্নানের উদ্দেশ্যে গঙ্গাসাগরে যাওয়ার পথে উত্তরপ্রদেশ থেকে আসা তিন জন সাধু পুরুলিয়াতে শারীরিক নির্যাতনের শিকার হন। তারপর এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে উত্তাল হয়ে ওঠে রাজ্য। তিন সাধুর আক্রান্ত হওয়ার ঘটনায় রাজ্যের আইন-শৃঙ্খলা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছে রাজনৈতিক মহল। তাদের অভিযোগ, এই ঘটনার পেছনে রাজ্যের শাসক দল তৃণমূলের হাত রয়েছে। গঙ্গাসাগরে মকর সংক্রান্তি উপলক্ষ্যে পুণ্য স্নানে যাওয়ার উদ্দেশ্যে উত্তরপ্রদেশ থেকে তিন জন সাধুর দল রওনা দিয়েছিলেন। মাঝপথে পুরুলিয়ার কাশীপুর এলাকায় এই ৩ জন সাধু আক্রান্ত হয়েছেন, ভাঙচুর করা হয়েছে তাদের গাড়িও। নিছক গুজবের জেরে ওই তিন সাধু আক্রান্ত হন বলে জানা গিয়েছে। পুলিশ সুপার অভিজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায় জানিয়েছেন, এই ঘটনায় ১২ জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে। ধৃতদের রঘুনাথপুর মহকুমা আদালতে তোলা হয়।

পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পর্কে অযোধ্যার রামমন্দিরের মুখ্য পুরোহিত আচার্য সত্যেন্দ্র দাস বলেন, গেরুয়া রং দেখলেই ক্ষোভে জ্বলে ওঠেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। রামনবমীর দিনেও ঠিক একই ভাবে ধর্মীয় শোভাযাত্রার উপর হামলা হয়েছিল পশ্চিমবঙ্গে। এই ধরনের হামলার তীব্র প্রতিবাদ জানাচ্ছি। ১৩ তারিখ সকাল থেকে সোশ্যাল মিডিয়ায় একটি ভিডিয়ো ছড়িয়ে পড়ে, যেখানে দেখা যায় একদল জনতা পুরুলিয়া জেলায় গঙ্গাসাগরগামী কয়েকজন সাধুর উপর আক্রমণ চালাচ্ছে। ভিডিয়োটিতে সাধুদের নিগৃহীত হতে দেখা যায়। সাধুদের নিগ্রহ ও হেনস্থার প্রতিবাদে গত ১৬ জানুয়ারি বেলা ১টায় বিশ্ব হিন্দু পরিষদের তরফে কলকাতার সুবোধ মল্লিক স্কোয়্যারে জমায়েত এবং সুবোধ মল্লিক স্কোয়্যার থেকে ধর্মতলা ওয়াই চ্যানেল হয়ে রাজভবন পর্যন্ত একটি প্রতিবাদ মিছিল আয়োজিত হয়।

ভাটপাড়ায় হিন্দু জাগরণ মঞ্চের গঙ্গারতি অনুষ্ঠান

নিজস্ব প্রতিনিধি।। হিন্দু জাগরণ মঞ্চ, ভাটপাড়ার উদ্যোগে গত ১৪ জানুয়ারি ভাটপাড়ার বলরাম সরকার ঘাটের গঙ্গাতীরে মকর সংক্রান্তি উপলক্ষ্যে অনুষ্ঠিত হলো গঙ্গা আরতির অনুষ্ঠান। প্রধান অতিথি রূপে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের রাজ্যপাল ড. সি ভি আনন্দ বোস। উপস্থিত ছিলেন রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের ব্যারাকপুর জেলা কার্যবাহ ইন্দ্রনাথ রায়, হিন্দু জাগরণ মঞ্চের প্রান্ত প্রমুখ তাপস বারিক, রোহিত সাউ প্রমুখ। গঙ্গা আরতির প্রধান পুরোহিত ছিলেন সঞ্জয় শাস্ত্রী। হাজার দুয়েক পুণ্যার্থীর স্বতঃস্ফূর্ত উদ্দীপনায় সুসম্পন্ন হয় গঙ্গারতি অনুষ্ঠানটি। উল্লেখ্য, কাঁকিনাড়া গঙ্গারতি সমিতির পক্ষ থেকে ১০ম বর্ষ উপলক্ষে গত ২৭ নভেম্বর কাঁকিনাড়া পেপার মিল ঘাটে অনুষ্ঠিত হয়েছিল গঙ্গারতির অনুষ্ঠান।

অযোধ্যা সাজাতে চন্দননগর থেকে রওনা দিলেন আলোকশিল্পীরা

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ রামমন্দিরের শুভ উদ্বোধন। মন্দির ও অযোধ্যার পথঘাট আলোকমালায় সাজিয়ে তুলতে চন্দননগর থেকে উত্তরপ্রদেশ রওনা হয়েছেন পশ্চিমবঙ্গের ১৫০ জন আলোকশিল্পী। অযোধ্যাকে আলোকসজ্জায় সাজিয়ে তোলার জন্য ২ কোটি টাকায় চুক্তিবদ্ধ হয়েছেন চন্দননগরের শিল্পীরা। এর আগে দীপাবলীতে অযোধ্যার পথঘাট সেজে উঠেছিল আলোকমালায়। ২২ জানুয়ারি উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকবেন দেশ বিদেশের গণ্যমান্য বহু অতিথি। তাঁদের সামনে আলোর মাধ্যমে ফুটিয়ে তোলা হবে শ্রীরামচন্দ্রের বিভিন্ন জীবন কাহিনি।

মন্দির ও মন্দিরে প্রবেশের রাস্তা সেজে উঠবে চন্দননগরের আলোয়। ফিরোজাবাদ থেকে অযোধ্যার রামমন্দিরের প্রবেশ দ্বার পর্যন্ত সাজানো হবে আলোকমালায়। এছাড়া পদ্মফুলের আকারের আলোয় সাজবে রাস্তার দু'পাশ। জানা গিয়েছে, প্রায় ৩০০টি আলোর গেট থাকবে রামমন্দির যাওয়ার রাস্তায়। এই গেটগুলি এক বছর ধরে থাকবে। তাই লোহার স্ট্রাকচারের ওপর এলইডি আলো দিয়ে এই গেট তৈরি করা হচ্ছে। গত ১৩ জানুয়ারি শিল্পীরা আলোর সরঞ্জাম ও অন্যান্য কর্মীদের নিয়ে রওনা দিয়েছেন। চন্দননগরের আলোকশিল্পী মনোজ সাহা সংবাদমাধ্যমকে জানিয়েছেন, কিছু আলো নিয়ে যাওয়া হচ্ছে তৈরি করে, আবার কিছু তৈরি হবে অযোধ্যায় পৌঁছে। ২০ জানুয়ারির মধ্যে সব কাজ শেষ করা হবে। বাবাই কর নামে এক আলোক শিল্পী সংবাদমাধ্যমকে বলেন, 'এমনিতে চন্দননগরের লাইটের সঙ্গে সকলে পরিচিত, কিন্তু রামমন্দিরকে যে লাইট দিয়ে সজ্জিত করা হবে, তা একেবারে নতুন ধরনের। দ্রুত কাজ শেষ করার জন্য আমরা আজই রওনা দিচ্ছি'। অন্য এক শিল্পী জানিয়েছেন, ১০ কিলোমিটার জুড়ে এই লাইটিং হবে।

SANHIT POLYMER

Sriniketan Road, Bolpur, Birbhum, West Bengal - 731204

Phone : +91+3463-255-560 / 257-769, E-mail : sanhitpolymer@yahoo.co.in

Fax :+91-3463-254215

Factory : Shibtala-Surul Road, Bolpur, Dist. : Birbhum, West Bangal 731204, Phone : +91+3463-234517 / 645017 / 09732024706

APPLICATION

Industry & Packaging

PP - Icecream cup & Container

HDPE LLDPE Tarpaulim

Pond Liner

Pole (Concrete)

Green House

Geomembrane

LDPE Film/Sheet

'CORAL' Water Tank

Disposal Glass & Cup

HDPE Pipe

With Best Compliments From :-

MUKHERJEE ENGINEERING CO.

Manufacturer of

R. C. C. SPUN PIPES, COLLARS & ALLIED ITEMS

Head Office & Workshop

Sriniketan Road, Bolpur, Pin - 731 204

Phone : (03463) 254-215 (O), Mobile : 9434009737, 919434762433

E-mail : mukherjeeengineeringco@yahoo.com Fax : 03463-254215

bharat

Litho

puts life in printing

98/4, S. N. Banerjee Road
Kolkata - 700 014
(India)
Phone : +91 33 22657862, 22493855
Fax : + 91 22651063
bharatlitho@gmail.com
surendradhote@gmail.com,
www.bharatlitho.com

With Best Compliments

from-

Sindhuja Indocorp Pvt. Ltd.

5, Clive Row, 2nd Floor
Room No. 56
Kolkata - 700 001

DAYAL INDUSTRIES

DAYAL GROUP

MAKER OF INDUSTRIAL BLADES

Works

GOPALPUR HOUSE P.O. : R. GOPALPUR
GOPALPUR, 24 PARGANAS (North), PIN-700 136

Office :

3, Synagogue Street, Room No. 12, 2nd Floor, Kolkata 700 001
PHONE : 22424296/22434571, 033-22421761